সরল-জটিল

...........সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিহারের এক নিরিবিলি অঞ্চলে কিছুদিন ধরে বসবাস করছে একজন নিঃসঙ্গতা প্রিয় মানুষ। তার নাম অভিমন্যু সরকার। তার বয়েস আটত্রিশ, বেশ দীর্ঘকায়, বাঙালিদের মধ্যে বেশ সুপুরুষই বলা যায়। এই পাহাড়ি গ্রামটির প্রায় প্রান্ত সীমায় সে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, বাড়িটি ছোট কিন্তু সংলগ্ন বাগান অনেকখানি। আশেপাশে আরও কিছু বাড়ি রয়েছে, তবে অধিকাংশ বাড়ি খালি, ছুটিছাটাতে বাড়ির মালিকরা বেড়াতে আসে, অন্য সময় তালাবন্ধ থাকে। এই গ্রামটির ঠিক পরেই একটি সংরক্ষিত অরণ্য।

অভিমন্যু সরকারের বাড়ি থেকে কয়েক শো গজ দূরে যে বাড়িটি দেখা যায়, সেই বাড়িতে

থাকে এক বৃদ্ধ ও এক তরুণী, তাদের বাবা-মেয়ে মনে হলেও তারা স্বামী-স্ত্রী। অন্য কয়েকটি বাড়িতেও কিছু কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকেন সারা বছর। স্থানীয় আদিবাসী পরিচারক-পরিচারিকারা তাদের দেখাশুনো করে। এখানে অভিমন্যু সরকারের মতন একজন শক্ত সমর্থ যুবকের দিনের পর দিন একা থাকাটা অস্বাভাবিক মনে হয়। তার বাড়িতে শহর থেকে কেউ বেড়াতে আসে না, সেও এখানকার অন্যদের সঙ্গে মেশে না।

ভোরবেলা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অভিমন্যু। সদ্য শীত শুরু হয়েছে, বাতাস ও রোদ্দুর বড় মোলায়েম। তবে এ সময়েও এখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। গাছপালাগুলো ঝকঝকে তকতকে। বেশ কিছু মরশুমি ফুল ফুটেছে। হাঁটতে হাঁটতে অভিমন্যু এক একবার থেমে কোনও গাছের পাতায় হাত বুলোয় খুব মমতার সঙ্গে। ফিসফিস করে কথাও বলে মনে হয়। সে কোনও ফুল ছেঁড়ে না, নুয়ে গন্ধ শোঁকে।

ভারি শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ। লালচে রঙের রাস্তা দিয়ে একটা গরুর গাড়ি চলেছে টিমটিমিয়ে। দুটো মোষ চড়াতে নিয়ে যাচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে, তার মাথায় মস্ত পাগড়ি, হাতে বাঁশি। জবা ফুলের গাছে ওড়াওড়ি করছে ভ্রমর। এই সময় একটা সাপও দেখা যায়। ঘাসের উপর দিয়ে সাপটা চলেছে এঁকেবেঁকে।

অভিমন্যুর থেকে সাপটা বেশি দূরে নয়। প্রথম কিছুক্ষণ অভিমন্যু সাপটাকে দেখতে পায় না। সাপটাও ওকে দেখেনি। দুজনেই রয়েছে আপন মনে।

বাড়ির ভেতর থেকে একটি প্রৌঢ়া আদিবাসী মেয়ে বেরিয়ে আসে একটা বেড়াল তাড়া করে। বেড়ালটি দৌড়ে পালায়। স্ত্রীলোকটি বেড়ালটির উদ্দেশে গালাগালি করতে থাকে।

সেদিকে ফিরে তাকাতেই অভিমন্যু সাপটাকে দেখতে পায়। কোনও রকম ভয়ের চিহ্ন তার মুখে ফোটে না। সে বরং দু-এক পা এগিয়ে গিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে সাপটাকে লক্ষ করতে থাকে।

আদিবাসী পরিচারিকাটির নাম ফুলমণি। সে আবার বেরিয়ে এল এক কাপ চা নিয়ে। দূর থেকে বলল, বাবু, আপনার চা।

মুখ তুলে তাকিয়ে তাকে দেখে অভিমন্যু বলল, সিঁড়ির ওপর রেখে দে।

ফুলমণি শুনতে পেল না। সে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, হারামজাদা বেড়ালটা দুধে মুখ দিয়েছে। আর দুধ নেই। গাঁয়ে দুধ আনতে যেতে হবে। এখন কালো চা খান।

অভিমন্যু হাত তুলে বলল, এদিকে আসতে হবে না, কাপটা সিঁড়ির ওপর রেখে দে।

সাপটা একটা ব্যাঙ বা পোকামাকড় কিছু ধরেছে, ঘাসের মধ্যে খানিকটা নড়াচড়া দেখা গেল। ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, সাপ ! সাপ !

অভিমন্যু একটুও বিচলিত হল না। খানিকটা বিরক্তভাবে বলল, অত চ্যাঁচাবার কী আছে ? চুপ কর।

ফুলমণি তবু বলল, ওরে বাবা, কত বড় সাপ।

রাস্তায় গরুর গাড়িটা থামিয়ে গাড়োয়ান তড়াক করে নেমে ছুটে এল এদিকে। মোষ চড়ানো রাখালটিও দৌড়চ্ছে। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল।

বাড়ির একটা জানলায় এসে দাঁড়ালো একটি ন-দশ বছরের ছেলে। টানাটানা চোখ, ভারি সুন্দর তার মুখখানি।

অভিমন্যু হাততালি দিয়ে সাপটাকে তাড়াবার জন্য বলতে লাগল, যাঃ যাঃ।

ফুলমণি এদিক-ওদিক তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে, ডান্ডা লে আও, একঠো টাঙ্গি লে আও !

ভিড়ের থেকে একজন বলে উঠল, বিষাক্ত সাপ, ফণা তুলেছে। একবার কাটলে আর রক্ষে নেই।

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাচ্চা ছেলেটি, তার হাতে একটা লম্বা লাঠি। তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে ফুলমণি ধরতে গেল, কিন্তু ছেলেটি এগিয়ে আসতে চায়। ফুলমণির কাছ থেকে সে কোনওক্রমে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে।

অভিমন্যু হুকুমের সুরে বলল, রাজা, আর এগোবে না।

রাজা মুখ তুলে চাইল তার বাবার দিকে। রাজার মুখে কিছু একটা অস্বাভাবিক ছাপ আছে। বাবার আদেশ সে অগ্রাহ্য করতে চায়। পুতুলের মতন ভঙ্গিতে সে সামনের দিকে এগিয়ে দিল এক পা।

অভিমন্যু আবার বলল, রাজা আর এগোবে না বলছি। খবরদার এগোবে না।

রাজা তবু লাঠিটা উঁচিয়ে আবার এগোতে যেতেই ফুলমণি তার জামা চেপে ধরল। ভিড় ঠেলে একজন লোক পিছন দিক থেকে ফস করে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল অভিমন্যুর দিকে। অভিমন্যু সেটা লুফে নিল।

মাঠ দিয়ে আরও দু-তিনজন লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে আসছে।

লাঠিটা নিয়ে অভিমন্যু সাপটার এত কাছে এগিয়ে গেল যে সকলেই ভয়ে চিৎকার করে উঠল। সাপটাকে ঠিক মারবার জন্য নয়, অন্য এক ভঙ্গিতে লাঠিটা চালিয়ে দিল অভিমন্যু। খানিকটা ধুলো উড়িয়ে ঘাস ছিড়ে, সেই লাঠির ঘায়ের চোটে অনেকখানি শূন্যে উঠে গেল সাপটা। তারপর ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগল। ভয়ের চোটে ভিড়ের সবাই দৌড় লাগিয়েছে।

অভিমন্যু মুখ উঁচু করে দেখতে লাগল সাপটা কতটা উঁচুতে উঠেছে। এতক্ষণে তার মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। এক সময় সে ভাল হকি খেলোয়াড় ছিল। এখনও ভোলেনি। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, সে যেন হকি খেলার পোশাক পরে আছে আগেকার মতন, তার পাশ দিয়ে অন্য খেলোয়াড়রা দৌড়চ্ছে, তার হাতের হকি স্টিক নিয়ে সে মারছে বল।

এ বাড়ির কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল কিছু দূরের আর একটা বাড়িতে। ঘরের মধ্যে টেবিলে বসে এক বৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। বৃদ্ধটির নাম রঙ্গলাল মিশ্র, যদিও তাঁর মাথার চুল সব সাদা, দাড়িও কাঁচাপাকা, তবু তিনি বেশ ছটফটে ধরনের মানুষ। ডবল ডিমের ওমলেট, অনেকগুলো টোস্ট, মাখন-মার্মালেড, ফলের রস এরকম অনেক খাবার তিনি বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর ছিপছিপে তরুণী স্ত্রী।

রঙ্গলাল বললেন, ওখানে গোলমাল হচ্ছে কীসের ?

রঙ্গলালের স্ত্রী ছবি জানলার কাছে দাঁড়াল। বাইরে তাকিয়ে বলল, কী জানি, বুঝতে পারছি না।

তারপর ভৃত্যের উদ্দেশে বলল, রামপূজন, ও বাড়িতে কী হচ্ছে দেখে আয় তো !

রামপূজন বাটনা বাটা ছেড়ে দৌড়ে গেল।

রঙ্গলাল একটা টোস্টে কামড় দিয়ে বললেন, ও বাড়ির লোকটা কেমন যেন অদ্ভুত। কারোর সঙ্গে মেশে না। কক্ষনো বাড়ির বাইরেও যায় না।

ছবি বলল, রাত্তিরে বেরোয়।

রঙ্গলাল ভুরু কুঁচকে বললেন, রাত্তিরে বেরোয় ? তুই জানলি কী করে ?

ছবি বলল, আমি দু-একদিন দেখেছি। একটা টর্চ নিয়ে জঙ্গলের দিকে যায়।

রঙ্গলাল বললেন, রাত্তিরে একা একা জঙ্গলে যায় ? কেন ?

ছবি বলল, তা আমি কেমন করে জানব ?

রঙ্গলাল বললেন, জোয়ান মরদ, ওর বউ নেই। বাড়িতে কোনও মেয়েমানুষ আসে না। দু-তিন মাস হল বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে, না ? এর মধ্যে কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।

ছবি বলল, বউ আছে বোধহয়। কিংবা ছিল। একটা ছেলে তো রয়েছে দেখছি।

রঙ্গলাল বললেন, ওটা ওর নিজের ছেলে ! ও ছেলেটা তো বোবা, এ পর্যন্ত ওর মুখে একটাও শব্দ শুনিনি।

ছবি বলল, ছেলেটা কথা বলে না। কিন্তু শব্দ করে। একদিন আমি ওকে খুঁ খুঁ করে

কাঁদতে শুনেছি।

রঙ্গলাল জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোথায় ওকে কাঁদতে শুনলি ?

ছবি বলল, একদিন ওদের বাগানে দুপুরবেলা একটা গুলমোহর গাছের নীচে ছেলেটা একা একা কাঁদছিল।

রঙ্গলাল বললেন, বোধহয় ওর মা মরে গেছে। আহা বেচারা। কিন্তু ওর বাপটা আবার বিয়ে করেনি কেন ? এ বয়েসের ছেলেরা যদি কোনও মেয়েমানুষের সঙ্গ না পায়, তা হলে তাদের জীবনটা রুক্ষ হয়ে যায়।

ছবি বলল, ছেলেটাকে ডাকলে কাছে আসে না।

রঙ্গলাল বললেন, বউ মরেছে বলেই কি সারা জীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে ? ভেরি ব্যাড ফর হেলথ।

ছবি বলল, ওর বউ মরেছে তা ধরে নিচ্ছেন কেন ? অন্য কিছুও হতে পারে।

রঙ্গলাল বললেন, সে যাই হোক। বউ থাকলেও অন্য মেয়ে মানুষ দেখলে পুরুষের শরীর চনমন করে। তাতে মগজ খোলসা হয়। ওই জোয়ান মরদটা মাসের পর মাস কোনও মেয়ের সঙ্গে কথাও না বলে থাকে কী করে ?

তারপর দুষ্টু হেসে আবার বললেন, হ্যাঁরে ছবি, ওই লোকটা গোপনে তোর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করেছে ?

ছবি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, আমি কোনও উটকো লোকের সঙ্গে কথা বলি নাকি ? ওই লোকটাকে নিয়ে আপনার এত মাথা ব্যথা কেন ?

রঙ্গলাল বললেন, কৌতূহল একটা ভাল গুণ, বুঝলি ? মানুষ সম্পর্কে যার কৌতূহল নেই, তার জীবনটা অতি বিস্বাদ হয় !

জানলার বাইরে থেকে রামপূজন বলল, ও বাড়ির বাগানে একটা সাপ বেরিয়েছে, মস্ত বড় সাপ !

সাপ শুনেই রঙ্গলাল মাটি থেকে পা তুলে নিলেন। মুখ বিকৃত করে বললেন, এই নামটা শুনলেই আমার গা ঘিনঘিন করে। এই জায়গাটার আর সব ভাল, কিন্তু বড় সাপের উপদ্রব।

খাবারের প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বললেন, খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেল। বাকিটা তুই খেয়ে নে।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে তিনি একজোড়া নাচের ঘুঙুর বার করলেন।

সেই ঘুঙুর নিজের পায়ে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, যাই, লোকটার সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করে দেখি।

উঠে দাঁড়িয়ে দু-পায়ে ঝুমঝুম শব্দ করে বললেন, সাপ আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না কখনও।

একটা লাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রঙ্গলাল। ছবি মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

অভিমন্যুর বাড়ির বাগানে এখন আর বাইরের কেউ নেই। একটু আগেই যে অনেক লোক জমেছিল, তা বোঝা যায় না।

একটা গোলাপ ফুল গাছের কাছে মাটিতে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে আছে অভিমন্যু। তার হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। গাছটায় কিছু ফুল ফুটে আছে। দু-একটা আধফোটা এবং কয়েকটা ফোটা কুঁড়ি। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে একটা না ফোটা কুঁড়ি মন দিয়ে দেখছে অভিমন্যু।

সিঁড়িতে বসে তার ছেলে রাজা একটা বইয়ের পাতা ছিঁড়ছে। তার পড়ার বই। এক একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়।

বাগানের গেট খুলে, ঝুমঝুম শব্দ করতে করতে রঙ্গলাম মিশ্র এগিয়ে এলেন অভিমন্যুর দিকে। বেশ কাছে এসে দাঁড়ালেন। তবু অভিমন্যু গ্রাহ্য করল না।

রঙ্গলাল নাচের ভঙ্গিতে জোরে জোরে পা ঠুকলেন কয়েকবার।

অভিমন্যু এবার ফিরে তাকাল। তার দৃষ্টিতে কোনও বিস্ময় নেই। এই বৃদ্ধটি আগেও দু-একবার দেখা করতে এসেছেন নিজে থেকেই, অভিমন্যু তেমন আমল দেয়নি। এখন সে একটু বিরক্তই হল।

রঙ্গলাল বললেন, নমস্কার। গুড মর্নিং।

অভিমন্যু বিরক্তি গোপন করে বলল, নমস্কার।

রঙ্গলাল বললেন, আপনার বাগানে নাকি একটা গোখরো সাপ বেড়িয়েছিল।

অভিমন্যু বলল, গোখরো কিনা জানি না। একটা সাপ এসেছিল ঠিকই।

রঙ্গলাল বললেন, পালায়নি তো ? মারতে পারলেন ?

অভিমন্যু বলল, শুধু শুধু মেরে কী হবে ? জঙ্গলের দিকে ছেড়ে দিয়ে এলাম।

রঙ্গলাল চোখ বড় বড় করে বললেন, মারলেন না ? অত সাপের ওপর দয়া করবেন না। এখানে সব বিষাক্ত সাপ ঘুরে বেড়ায়। হীরালাল বসুর ছেলেটা তো সাপের কামড়ে মারাই গেল। Prevention is better than cure. এই দেখুন না, আমি কী ব্যবস্থা নিয়েছি।

অভিমন্যু বলল, এটা কী ব্যাপার ?

রঙ্গলাল বললেন, Vibration ! শব্দ তরঙ্গ। সাপ কানে শুনতে পায় না জানেন তো ? বাতাসে এরকম শব্দ তরঙ্গ উঠলে ওরা শরীরে টের পায়, তক্ষুনি দূরে পালায়।

তিনি আবার ঝুমঝুম শব্দ করলেন।

অভিমন্যু বলল, কিন্তু শব্দটা তো নিজের কানেই খারাপ লাগবে।

রঙ্গলাল বললেন, একটু নাচ প্র্যাকটিস করে নেবেন, তখন আর খারাপ লাগবে না। আপনার বাড়িতে অতিথি এলে বুঝি চা খেতেও বলেন না ?

অভিমন্যু বলল, আমি দুঃখিত, আমাদের দুধ নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ব্ল্যাক টি খাবেন ?

রঙ্গলাল বললেন, দুধ নষ্ট হয়ে গেছে তো আমাদের কাছে চেয়ে পাঠাননি কেন ? প্রতিবেশীর কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে বা বিপদে-আপদে পরস্পর সাহায্য করাই তো সমাজের ধর্ম।

অভিমন্যু চুপ করে রইল।

রঙ্গলাল বললেন, আপনার বাড়িতে যে কাজ করে, তার নাম কী যেন ? তাকে একবার ডাকুন না।

অভিমন্যু হাঁক দিল, ফুলমণি, ফুলমণি।

ফুলমণি বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তার উদ্দেশে রঙ্গলাল বললেন, এই মেয়ে চায়ের দুধ নেই তো আমাদের বাড়ি থেকে আনতে যাওনি কেন ? যাও, ছুট্টে একবাটি দুধ নিয়ে এসো, তারপর আমাদের দু-কাপ চা খাওয়াও।

ফুলমণি পিছন ফিরতেই তিনি বললেন, আর শোনো, একটা মোড়া বা চেয়ার-টেয়ার কিছু এখানে দিয়ে যাও তো আমার জন্য। আমি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি না।

তারপর তিনি এক গাল হেসে অভিমন্যুকে বললেন, আমি আপনাকে ডিসটার্ব করছি, তাই না ? খুব সিরিয়াস কোনও কাজ করছিলেন ?

অভিমন্যু গম্ভীরভাবে বলল, এই একটা জিনিস দেখছিলাম।

রঙ্গলাল বললেন, মানুষ একা একা নিরিবিলিতে থাকতে চাইলেও অন্যরা তা দেয় না। আমাদের দেশে খাঁটি নির্জন জায়গা কোথাও নেই। আমার মশাই একটু বকবক করা

স্বভাব। এক সময় উকিল ছিলাম কিনা। আদালতে লম্বা লম্বা বক্তৃতায় কথার ফুলঝুরি ছুটিয়েছি। আপনি কী জিনিস দেখছিলেন।

অভিমন্যু বলল, কী করে আস্তে আস্তে ফুল ফোটে তাই দেখছিলাম।

রঙ্গলাল বললেন, তা দেখে কী হবে ?

অভিমন্যু বলল, কিছুই হবে না। এমনিই।

রঙ্গলাল বললেন, ডারউইন সাহেবের মতন নতুন কিছু আবিষ্কার করবেন নাকি ?

অভিমন্যু চুপ করে রইল। সে বুঝিয়ে দিতে চাইল, এ সব কথার সে উত্তর দেবে না।

ফুলমণি একটা মোড়া এনে পেতে দিল।

তাতে বসার পর কণ্ঠস্বর বদলে রঙ্গলাল বললেন, এমনি এমনিও মানুষ অনেক কিছু করে বটে। শখের জন্য। একটু আগে এখানে সাপ বেরিয়েছিল। অনেক সময় কাছাকাছি জোড়া সাপ থাকে, তাও আপনি মাটিতে এইভাবে বসে আছেন দেখে আপনার সম্পর্কে আমার কৌতূহল বাড়ছে। আচ্ছা সরকারবাবু, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন ? সাধারণ পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গরা কি রং চেনে ? নানান রঙের বৈচিত্র্য বুঝতে পারে ?

অভিমন্যু বলল, আমি ঠিক জানি না।

রঙ্গলাল বললেন, তা হলে প্রকৃতিতে এত রঙের বাহার কেন ? এই যে এত রকমের ফুল, এত রঙের বাহার, কত রকম সূক্ষ্ম ডিজাইন, এর কোনওটাই কিন্তু মানুষের জন্য নয়। মানুষের জন্য ফুল ফোটে না। মানুষকে এরা গ্রাহ্যই করে না। ওরা শুধু কীট-পতঙ্গদের চেনে।

হাতের লাঠিটা তুলে কয়েকটা ফুল দেখিয়ে বললেন, এই যে দেখুন না, এই ফুলগুলো বেশ্যার মতন সেজেগুজে বসে আছে, কখন একটা কালো কুচ্ছিৎ ভোমরা কিংবা মৌমাছি এসে ঢলাঢলি করবে !

অভিমন্যু এবার বিস্মিতভাবে মুখ ঘুরিয়ে রঙ্গলালের দিকে চেয়ে রইল। লোকটিকে সে যে রকম বিরক্তিকর বকবকানি বুড়ো ভেবেছিল, ঠিক সে রকম নয়।

বৃদ্ধ আবার বললেন, ফুল নিয়ে কত কাব্য লেখা হয়েছে, কত গান বাঁধা হয়েছে, ফুলেরা তার কিচ্ছু জানে ! এই যে আকাশ, চাঁদ-তারা, তা নিয়েও কি কম কাব্যি করা হয়েছে ?

ওরা মানুষের কথা জানেই না। মানুষের যা কিছু সৃষ্টি, মানুষের চোখে যা কিছু সুন্দর, সব নিজের জন্য।

একটু ঝুঁকে এসে এক চোখ টিপে বললেন, মেয়েদের ব্যাপারেও ওই একই কথা। বেশিরভাগ পদ্যই তো মেয়েদের নিয়ে লেখা হয়, কিন্তু কটা মেয়ে তা বোঝে ? একটা মেয়েকে নিয়ে আপনি ঝুরি ঝুরি পদ্য লিখে তাকে শোনাতে যান, দেখবেন একটু পরে সে হাই তুলছে। আমার এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেকবার, আপনার হয়নি ?

সামনের রাস্তা দিয়ে দুটো মোষ ছুটে গেল। তার পেছন পেছন বাঁশি হাতে রাখাল ছেলেটি। রাজা সেই দিকে তাকিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে এল। অভিমন্যু রঙ্গলালের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল রাজার দিকে।

রঙ্গলাল বিষয় বদলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে মশাই ?

অভিমন্যু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমার নাম অভিমন্যু সরকার। আমি একজন সাধারণ মানুষ।

রঙ্গলাল বললেন, আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কে ? আমি উত্তর দিতাম, আমি বাঁদরদের বংশধর। মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে মানুষ হয়েছি। এখনও অনেক বাঁদরামি যায়নি ? হে হে হে।

রাজা এগিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। অভিমন্যু গলা চড়িয়ে বলল, রাজা, ওদিকে যাসনি। বাইরে যাবি না।

রঙ্গলাল বললেন, ওকি শুনতে পাবে ? যারা বোবা হয়, তারা কালাও হয়।

অভিমন্যু ঝাঁঝালো সুরে বলল, আমার ছেলে বোবা নয়। কথা বলতে পারে। কিন্তু কথা বলে না।

রঙ্গলাল বিস্মিতভাবে বললেন, পারে। তবু কথা বলে না কেন ? ওইটুকু বাচ্চা !

রাজা একবার ফিরে তাকাল অভিমন্যুর দিকে। স্পষ্ট ভাবে বাবার কথা অবহেলা করে সে ছুট দিল গেটের দিকে।

-বাইরে যাবি না -বাইরে যাবি না বলতে বলতে অভিমন্যু উঠে দাঁড়াল। তারপর সেও ছুটে গেল ছেলেকে ধরতে।

যে রাস্তাটা এই সব বসতির পাশ দিয়ে জঙ্গলের দিকে গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে আসছে একটা গাড়ির বহর। অভিমন্যুর বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। দুটো জিপ গাড়ি, তারপর একটা ট্রাক। সব গাড়িগুলি নানা বয়েসি মানুষে ভর্তি। সবাই মিলে একটা গান গাইছে। পুরোনো হিন্দি সিনেমার পরিচিত গান।

প্রথমে মনে হয় পিকনিক পার্টি। আসলে এরা ফিল্মের লোকজন, আউটডোর শুটিং-এ এসেছে।

জিপ দুটো আগে আগে, ট্রাকটা পেছনে। ওপরটা খোলা। পেছনে মালপত্র রাখার জায়গায় পুরু করে বিছানা পাতা। সাত-আটজন নারী-পুরুষ বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক মাঝখানে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে একটি রমণী। সে যে নায়িকা তা এক নজরেই বোঝা যায়। খুব গাঢ় মেকাপ, পাতলা শাড়ি পরা। তার নাম সোহিনী।

তার আসল নাম কুরুতুলাইন হায়দার। কিন্তু এরকম খটোমটো নাম সিনেমার নায়িকার মানায় না। তাই সে নাম বদলে হয়েছে সোহিনী। ফিল্মে এরকম অনেকেই নাম বদলায়। তার ডাক নাম ছিল সোফি, সেটাও অনেকে ভুলে গেছে।

চলন্ত গাড়িতে গানের সঙ্গে নাচছেও কেউ কেউ। সোহিনী শুয়ে শুয়েই পা দিয়ে তাল দিচ্ছে।

গানটা একটু থামতেই সোহিনী বলে উঠল, ইস, আমার চোখে কী পড়ল বল তো ?

পাশ থেকে ললিতা নামে মেয়েটি বলল, কই, দেখি দেখি !

গান থামিয়ে সবাই সোহিনীর চোখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সোহিনী বলল, বিচ্ছিরি রাস্তা, যা ধুলো উড়ছে।

একজন কেউ বলল, আর বেশি দেরি নেই। আধঘন্টা, বড় জোর ফর্টি ফাইভ মিনিটস।

সোহিনী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, ললিতার কোমরে ওর হাত। সোহিনীর ঠোঁট এমন লাল যেন মনে হয় একটু আগে রক্ত পান করেছে। ভারি সুন্দর আর নরম তার মুখখানি। চোখ দুটি চঞ্চল। তাকে দেখলে বোঝাই যায় না, তার ব্যক্তিত্বের জোর কতখানি।

লরির একপাশে দাঁড়িয়ে চলমান জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সোহিনী জিজ্ঞেস করল, শশীবাবু, এখানে আউটডোর শুটিং মোট ক'দিন হবে ?

শশী নামে হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি প্রোডাকশন ম্যানেজার। এই ট্রাকের ওপর নায়ক বা পরিচালক কেউ নেই, তারা যাচ্ছে জিপে।

শশী বলল, সাত দিনের মধ্যে প্যাক আপ করার ইচ্ছে আছে। বড় জোর আট দিন।

সোহিনী আবার জিজ্ঞেস করল, হোল নাইট করতে হবে ক'দিন ?

শশী বলল, ঠিক দু'রাত, বড় জোর তিন রাত।

সোহিনী বলল, আর, তোমার ওই 'বড় জোর' নিয়ে পারি না। কোনও একটা হিসেবও কি ঠিকঠাক দিতে পারো না ?

শশী মুখ ভরিয়ে হেসে বলল, সব সময় কিছুটা আগ বাড়িয়ে রাখতে হয়। তাতে কেউ কিছু বলতে পারে না।

সোহিনী মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমাদের কটায় সময় আজ খেতে দেবে ? 'বড় জোর' ?

সবাই হেসে উঠল।

শশী বলল, কেন, তোমার খিদে পেয়েছে নাকি ?

সোহিনী বলল, পাবে না ? কাল রাত্তিরে কিছু দাঁতে কাটিনি। লেট নাইট পার্টি হলে আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না।

শশী ব্যস্ত হয়ে বলল, পাঁউরুটি-মাখন আছে, কেক-পেস্ট্রি আছে, কমলালেবু আছে। এতক্ষণ বলোনি কেন ? অনেক খাবার আছে।

সোহিনী বলল, ওসব কিছু খাব না। গরম হ্যামবার্গার খাওয়াতে পারবে ?

শশি বলল, সে এখানে কোথায় পাবো !

সোহিনী আঙুল তুলে বলল, তা হলে আমি খিচুড়ি খাব। হয় হ্যামবার্গার, অথবা খিচুড়ি। মাঝামাঝি কিছু না।

শশী বলল, এই তো পৌঁছেই খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ঘন্টাখানেক লাগবে, বড় জোর দেড় ঘন্টা !

সোহিনী একটুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমায় দশ তারিখ পুনা পৌঁছতেই হবে। তার মধ্যে তোমাদের কাজ শেষ হয় তো ভাল, নইলে আমার উপায় নেই। তাই নারে ললিতা ?

ললিতা বলল, নিশ্চয়ই, দশ তারিখ সকালের মধ্যেই না পৌঁছলে মহেশ্বরী হুলুস্থুল করবেন। ওঁর কাছে বড় জোর টর জোর চলে না। প্রতিটি মিনিট মাপা।

শশী বলল, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।

রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঝর্না চোখে পড়ল। অনেকটা জলপ্রপাতের মতন। ধোঁয়ার মতন জলকণা ছিটকে উঠছে, আওয়াজটাও সুন্দর।

সোহিনী হঠাৎ বলে উঠল, এখানে একটু থামতে বলো তো !

শশী বিস্মিতভাবে বলল, কেন, এখানে থামবে কেন ?

সোহিনী বলল, ওই ঝর্নাটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। একবার ওইখানটায় যাব।

এবার শশীর সহকারী ইমতিয়াজ বলে উঠল, ম্যাডাম, ওই ঝর্নাটা আমাদের লোকেশনের মধ্যেই আছে। ওখানে অনেকটা শুটিং হবে। তখন তো ওখানে আসবেনই।

সোহিনী বলল, শুটিং-এর সময় ছাড়া আমরা এমনি এমনি কোথাও যেতে পারি না বুঝি ? ওই ঝর্নাটার কাছে এখনই আমার একবার যাওয়া দরকার।

শশী বলল, দরকার ? তার মানে ? কীসের দরকার ?

সোহিনী একটা ফর্সা পা তুলে, মুচকি হেসে বলল, একবার চট করে পা ধুয়ে আসব।

ইমতিয়াজ বলল, এই যে বললেন, আপনার খিদে পেয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়, তত তাড়াতাড়ি রান্নার ব্যবস্থা করা যাবে।

সোহিনী বলল, খাওয়ার আগে পা ধুতে হয়। সেটাও খুব দরকারি কাজ।

শশী বলল, যত সব অদ্ভুত কথা !

স্কুলের দুষ্টু মেয়ের মতন মুখভঙ্গি করে, দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে খুব আস্তে আস্তে সোহিনী বলল, থামাবে না ? আমি বলছি, তাও একটু থামাবে না ? আমার ইচ্ছে করছে।

শশী বলল, দেরি হয়ে যাবে যে।

সোহিনী এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার ঠোঁটে হাসি মাখানো, চোখ দুটো যেন ধিকধিক করে জ্বলছে।

ডানার মতন দুটো হাত তুলে ওড়ার ভঙ্গি করে সে বলল, আমি যদি লাফিয়ে পড়ি, ঝর্নাটার কাছে উড়ে চলে যাই।

সত্যি সত্যি সে লাফাবার উদ্যোগ করতেই অন্যরা হই হই করে ধরতে গেল তাকে। শশী চিৎকার করতে লাগল, থামাও, থামাও।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে ট্রাকটা থেমে গেলে শোনা যেতে লাগল সোহিনীর অনর্গল হাসি।

প্রতি রাতেই রঙ্গলালের একবার ঘুম ভাঙে। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে।

এই সময় নিস্তব্ধতা ঝিমঝিম করে চতুর্দিকে। হ্যাঁ, নিস্তব্ধতারও একটা শব্দ আছে।

রঙ্গলালের ঘুম ভাঙা মানে একেবারে জেগে ওঠা। তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেন না, নেমে পড়েন খাট থেকে।

ছবি শোয় অন্যে একটা খাটে। এখানে বড় খাট নেই। ছবির এখন গভীর ঘুম।

বিছানার পাশে টর্চ থাকে। রঙ্গলাল টর্চ জ্বেলে ভাল করে দেখে নিলেন, কোনও সাপ ঢুকে পড়েছে কি না। সাপ সম্পর্কে ভয় তাঁর প্রায় বাতিকের মতন।

এইবার রঙ্গলাল কিছুক্ষণ সারা বাড়ি ঘুরবেন। কোনও কারণ নেই, এমনিই। এ ঘর, ও ঘর, বারান্দা, এমনকী উঁকি মারবেন রান্নাঘরেও।

ওকালতি থেকে রিটায়ার করেছেন পাকাপাকি, টাকাপয়সা জমিয়েছেন যথেষ্ট। এখন আর কোনও কাজ নেই। স্বাস্থ্য ফেরাবার নামে এখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন প্রায় তিন মাস। কিন্তু এখন আর তাঁর মন টিঁকছে না।

রাত্তিরের দিকে একটু একটু শীত করে। তাই শোওয়ার ঘরের সব জানলা বন্ধ। এ ঘরে আবার ফিরে এসে তিনি একটা জানলা খুলে ফেললেন।

এখন শুক্লপক্ষ, পরিষ্কার আকাশে ফটফট করছে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার নরম আলোয় গাছপালার চেহারা সব বদলে যায়। রঙ্গলাল অবশ্য শুধু চোর দেখেন না, মানুষ খোঁজেন। এ সময় চোর-টোররা আসে না ? আসা তো উচিত।

সাপ সম্পর্কে অত ভয় থাকলেও রঙ্গলালের কিন্তু চোর-ডাকাতের ভয় নেই।

এরকম নিরালা জায়গায় তিনি যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে রয়েছেন মাসের পর মাস। সেই জন্য

তিনি সঙ্গে রিভলবার রেখেছেন। একেবারে আনাড়ি নন, চালাতেও পারেন ভালই। ছাত্র বয়েসে এন সি সি-র ট্রেনিং নিয়েছিলেন, পরেও অভ্যেস বজায় রেখেছেন।

হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে! পহেলা প্রহরমে সবকই জাগে, দুসরা প্রহরমে যোগী, তিসরা প্রহরমে চৌরা জাগে, চউঠা প্রহরমে যোগী।

তার মানে এই তৃতীয় প্রহরে তো চোরদের ঘুরে বেড়াবার কথা। তারা এদিকে আসে না কেন?

একটা অস্ফুট শব্দ শুনে পেছন ফিরতেই তিনি চমকে উঠলেন।

ঘুমের মধ্যে ছবি এদিকে পাশ ফিরেছে। তার মুখে এসে পড়েছে জ্যোৎস্নার মৃদু আলো।

গাছপালার মতন মানুষের মুখও জ্যোৎস্নায় এমনভাবে বদলে যায়? রঙ্গলাল আগে কখনও দেখেননি তো।

ছবির মুখখানি যেন চেনাই যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ইতালিয়ান ভাস্কর্য।

বৃদ্ধ বয়েসে তরুণী ভার্যা। তাও বিয়ে হয়ে গেল প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর। চুল-দাড়ি সব পাকা বলে রঙ্গলালকে যতটা বুড়ো দেখায়, সেই তুলনায় তাঁর শরীর এখনও বেশ মজবুত আছে। কামনা-বাসনা আছে যথেষ্ট।

এই বয়েসের অনেক লোক চুল-দাড়িতে কলপ মেখে ছোকরা সেজে ঘুরে বেড়ায়। রঙ্গলাল ওসব পছন্দ করেন না। বিয়ের পর একবার ছবিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি চাও, আমি চুল কালো করি?

ছবি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, না, না, না, আমার নকল জিনিস একেবারেই ভাল লাগে না। এই ভাল, আপনাকে অনেকটা আমার বাবার মতন দেখায়!

ছবির ঘুম ভাঙেনি।

রঙ্গলালের খুব ইচ্ছে হল, ওকে ডেকে তুলবে। দুজনে পাশাপাশি বসে কিছুক্ষণ জ্যোৎস্না দেখলে কেমন হয়?

তারপর আপন মনে হাসলেন।

আচমকা ঘুম ভাঙালে অনেকেই বিরক্ত হয়। বিয়ের পর দু-তিন বছর জ্যোৎস্না কিংবা

চাঁদ-টাঁদ দেখতে ভাল লাগে। তারপর মনে হয় এসব ন্যাকামি।

তা ছাড়া বাবার বয়েসি স্বামীর সঙ্গে এ রকম আদিখ্যেতা একেবারেই মানায় না।

রঙ্গলালের মুশকিল এই, তাঁর যে এত বয়েস হয়ে গেছে, সেটা প্রায়ই ভুলে যান। মাঝে মাঝে চ্যাংড়ামি করতে ইচ্ছে করে। খুব ঝাল মাংস খেতে পারেন। বৃষ্টিতে ভিজতে পারেন খালি গায়ে। অন্যরা এসব দেখে ভাবে বুড়োর বুঝি ভিমরতি হয়েছে।

ছবিকে তো তিনি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করেননি।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। নিজের সম্পর্কে কিছুই গোপন করেননি। অল্প বয়েসে প্লুরিসি হয়েছিল বলে কখনও বিয়েই করবেন না ঠিক করেছিলেন। বন্ধুবান্ধবরা অবশ্য বলেছিলেন, ওতে কিছু যায় আসে না, ও রোগটাকে অত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। আদালত থেকে রিটায়ার করার বছরে হঠাৎ মনে হয়েছিল, এরপর তিনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবেন কী করে?

রঙ্গলালের এটা প্রথম বিয়ে, কিন্তু ছবির তা নয়। কলেজে পড়ার সময় সে একটা ভুল বিয়ে করেছিল। দেড় বছরের মাথায় সে বিয়ে ভেঙে যায়, সে উপলক্ষে দারুণ ঝড় এসেছিল ছবির জীবনে, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল মানসিক ভারসাম্য, চিকিৎসা করাতে হয়েছিল অনেকদিন। সোজা কথায় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সে কথা ছবি নিজেই স্বীকার করেছে রঙ্গলালের কাছে।

এসব জেনেশুনেই ছবিকে বিয়ে করেছিলেন রঙ্গলাল। এখন অবশ্য ছবির ব্যবহারে তার কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না।

রঙ্গলালের মনে হয়, বউটা একটু একটু পাগল থাকলে তো ভালই হত।

তাঁর আরও মনে হয়, ছবির বয়স্ক স্বামীটি বেশ নির্ভরযোগ্য, কিন্তু সে জন্য ছবি কতদিন কৃতজ্ঞ থাকবে? লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য যুবকের সঙ্গে তার প্রেম করতে ইচ্ছে করে না? সেটাই তো স্বাভাবিক।

ছবি অন্য কারওর সঙ্গে প্রেম করবে রঙ্গলাল কি সেটা মেনে নিতে পারবে? রঙ্গলাল সেটাই দেখতে চান। একটা কিছু ঘটুক না। নিছক নিস্তরঙ্গ জীবন তাঁর পছন্দ হয় না?

আবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরে।

এক সময় হঠাৎ তার মনে হল, দূরের ছাতিম গাছটার আড়ালে কী যেন নড়াচড়া করছে। বেশ বড়সড় কোনও প্রাণী।

প্রথমে তিনি ভাবলেন, ভাল্লুক নাকি ?

এখানে এসে তিনি অনেকবার শুনেছেন, পাশের জঙ্গলটায় ভাল্লুক আর হায়েনা আছে। এ পর্যন্ত একটাও চোখে পড়েনি অবশ্য।

ভাল্লুক রাত্তিরবেলা বেরিয়ে আসতে পারে।

গাছের আড়াল থেকে একটু সামনে আসতেই রঙ্গলাল বুঝতে পারলেন, ভাল্লুক নয়, মানুষ।

খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে মানুষটি। এই কি তবে চোর ? আসুক, আসুক।

আর একটু কাছে আসতে রঙ্গলাল চিনতে পারলেন। এ তাঁর প্রতিবেশী অভিমন্যু। হাতে একটা লাঠি। একবার মাটির দিকে টর্চও জ্বালাল।

এত রাতে মাটিতে কি কিছু খুঁজছে অভিমন্যু ?

এ বাড়ির দিকেই আসছে, নিশ্চয়ই চুরির উদ্দেশ্যে নয়। দেখলেই বোঝা যায়, শিক্ষিত মানুষ, সচ্ছল অবস্থা। এই ধরনের লোক ডাকাত দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে কিন্তু ছিঁচকে চোর হয় না।

ছবির জন্য আসছে ?

ছবি গভীরভাবে ঘুমুচ্ছে। অভিমন্যু সে উদ্দেশ্যে এলেও ছবিকে ডাকবে কী করে ? রাত্তিরবেলা ছবি লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে এই ছোকরাটির সঙ্গে দেখা করবে, এটা সম্ভব নয়। রঙ্গলালের পাতলা ঘুম, তা ছবি জানে।

যদি সত্যি সত্যি অভিমন্যুর সঙ্গে ছবির কোনও সম্পর্ক হয়ে থাকে, তা হলে ওদের পক্ষে সুবিধে হবে, রঙ্গলালকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া। কিংবা একেবারে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতেও পারে। যে রকম গল্পে উপন্যাসে থাকে।

বাস্তব জীবনেও এরকম হয় কখনও কখনও।

সেই যে রশিদ আলি নামে একজন এম এল এ ছিল, তাঁকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিল তার

স্ত্রী নাফিসা, সেই বিষ জোগাড় করে এনেছিল নাফিসার প্রেমিক নাসিরুদ্দিন। স্বামীকে বিষ খাইয়ে তাঁর পাশেই নাফিসা শুয়ে ছিল সারা রাত।

ওরা হয়তো ধরা পড়ত না, স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু রশিদ আলি যে শাসক দলের এম এল এ, সুতরাং তার আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে খবরের কাগজে তো লেখালেখি তো হবেই। এক কাগজে প্রেমিকটির কথা উল্লেখ করা থেকেই শুরু হয়ে গেল তদন্ত, তার পর সব ফাঁস হয়ে গেল।

রঙ্গলাল কল্পনা করলেন, তিনি বিষ খেয়ে মরে পড়ে আছেন, তাঁর পাশে শুয়ে আছে ছবি।

তিনি আবার হাসলেন। অত সহজ নাকি ? উকিলরা কখনও খুন হয় না।

নায়ক দেবশঙ্করের সঙ্গে সোহিনীর সাড়ে চার মাস ধরে কথা বন্ধ। অন্য সময় দেখা হলেও তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে, কিন্তু শুটিং-এ প্রেমের দৃশ্যে কিছুই বোঝার উপায় নেই। দেবশঙ্করের কোলে বসে পড়ে সোহিনী হাসতে হাসতে এমনভাবে তার গলা জড়িয়ে ধরে, যাতে তার স্তনের অনেকটা অংশ ভালভাবে দেখা যায়।

ভোর পাঁচটা থেকে সওয়া নটা পর্যন্ত এক টানা শুটিং হয়েছে। এখন রোদ বেশ চড়া। আবার বিকেলের আগে আলো একটু নরম হলে আবার শুটিং হবে।

রাত্তিরে কেউই ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। তাই সকালে প্যাক আপ হওয়ার পরই সবাই তাড়াতাড়ি শুতে চলে যায়। দুপুরে খাওয়ার সময় ওদের ডেকে ডেকে তুলতে হবে।

সোহিনী দিনের বেলা একেবারেই ঘুমোতে পারে না, বিছানার ধারেকাছেই যায় না। পর পর দু-রাত জেগে থাকলেও তার দিনের বেলা ঘুম দরকার হয় না, এ তার অদ্ভুত ক্ষমতা।

পুরোনো আমলের কোনও জমিদারের বাগান বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। অবস্থা বেশ জীর্ণ, ভেঙে পড়েছে কয়েকটা দেওয়াল। ছাদে গজিয়ে গেছে বট গাছ, তবে এই ফিল্মটায় একটা ভূতুড়ে বাড়ির কয়েকটা সিকোয়েন্স আছে, তাতে কাজে লেগে যাবে।

দেবশঙ্করের ঘর দোতলায়, সোহিনীকে দেওয়া হয়েছে একতলায় একেবারে পেছন দিকের

একটা বেশ বড় ঘর, ললিতাও থাকে তার সঙ্গে।

মেক আপ না তুলে, কস্টিউম পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে ললিতা, তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সোহিনী বলল, এই বেড়াতে যাবি ?

ললিতা কোনওরকমে চোখ খুলে আদুরে গলায় বলল, এখন ? না-আ। বড্ড ঘুম পেয়েছে যে ?

সোহিনী তাকে ধমক দিয়ে বলল, ওঠ, বেশি ঘুমোলে মুখ ফুলে যাবে, তোকে বিচ্ছিরি দেখাবে।

ললিতা বলল, আর একটু ... এই রোদ্দুরে কেউ বেড়াতে যায় ?

সোহিনী বলল, তবে থাক তুই। আর কোনওদিন আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বায়না করবি না।

সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সোহিনী।

কলকাতায় বা মুম্বাইতে তার একা একা কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সব সময় ভিড় জমে যায়। এখানে কাছাকাছি কোনও গ্রাম নেই, অনেকটাই জঙ্গল।

সোহিনী জঙ্গলের মধ্যেই হাঁটতে লাগল।

সিংভূম অঞ্চলের সব বড় বড় গাছ, ভিতরটায় প্রায় রোদই আসে না। বেশ ঠান্ডা, ছায়া ছায়া। কোনও গাছেই ফুল-টুল বিশেষ নেই, পাখিও বেশ কম, শুধু আছে নির্জনতা।

দূরে একটা ঝর্নার জলের ছল ছল শব্দ শোনা যাচ্ছে। সোহিনী সেই শব্দটা অনুসরণ করে এগোল।

শুধু ঝর্না নয়, সেটা ছোটখাটো একটা জলপ্রপাত। পাশে বড় বড় পাথর। খড়ি কিংবা কাঠ-কয়লা দিয়ে সেই সব পাথরে লেখা অনেক নাম। যারা এখানে বেড়াতে আসে, তারা নিজেদের অমর করে রাখতে চায়।

ঝর্নাটার খুব কাছে এগিয়ে এসে সোহিনী আপন মনে বলে উঠল ঃ

A quiet greenery, all around,
And at times an unknown wind blows,
One moutushi bird calling another,

And the sound of waters rhyming with it.

এক সময় সোহিনী খুব কবিতা পড়ত, হঠাৎ লাইনগুলো মনে পড়ে গেল।

সত্যিই একটা পাখি খুব মিষ্টি সুরে একটানা ডেকে যাচ্ছে। এটা কি মৌটুসি পাখি নাকি ?

সোহিনী পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছে না। সেও শিস দিতে লাগল। পাখিটা যেন তাকে সাড়া দিচ্ছে, সেও ডাকছে, পাখিটাও ডাকছে।

হঠাৎ সে একটা খিলখিল হাসির শব্দ শুনতে পেল। অল্প বয়েসি গলা।

এদিক ওদিক তাকিয়ে সোহিনী দেখল, একটু দূরে, ঝর্নার জলে পা ডুবিয়ে বড় পাথরের ওপর বসে আছে বছর দশেকের একটি ছেলে, হাফ প্যান্ট ও হলুদ টি শার্ট পরা। সে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সোহিনীর দিকে।

সোহিনী কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, একি, তুমি একা ?

ছেলেটি উত্তর দিল না।

সোহিনী আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি একা একা বসে আছ কেন ?

ছেলেটি তবু চুপ।

সোহিনী বলল, তুমি বুঝি বাংলা বোঝো না ? হিন্দি বলো ? তুম কৌন হ্যায় ?

ছেলেটি তবু তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে।

সোহিনী শাড়ি পরে খুব কম। জিনস আর শার্ট কিংবা শালোয়ার কামিজেই সে সচ্ছন্দ বোধ করে। কামিজের ওপর ওড়নাও ব্যবহার করে না। সে জানে, তার শরীরটা একটা বিশেষ সামগ্রী, সবাই দেখতে চায়, সে দেখাবে না কেন ?

কামিজের মধ্যে বোধহয় একটা পোকা ঢুকে গেছে। সোহিনী ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পোকাটা খুঁজতে লাগল, তাতে দৃশ্যমান হল তার ধপধপে সুগোল বুকের অনেকখানি।

সত্যিই একটা কাঠপিঁপড়ে ঢুকে গিয়েছিল, সেটা বার করে সে বালকটির দৃষ্টি অনুসরণ করল। সে তার বুক দেখছে।

অনেকেই ভাবে, ন-দশ বছরের ছেলেরা কিছু বোঝে না। ঠিকই বোঝে।

ছেলেটির মুখখানি ভারি সুন্দর, সারল্য মাখা। টানা টানা চোখ। কিন্তু কথা বলছে না কেন ?

সোহিনী বাচ্চাদের সঙ্গে সহজেই ভাব জমাতে পারে। এই ছেলেটা তার সামনে মুখ বুঁজে থাকবে, তা হতেই পারে না।

সে কাছে আর একটা পাথরে বসে পড়ে জলে পা ডোবাল। শালোয়ারটা গুটিয়ে নিল অনেকটা। নিখুঁত তার পায়ের পাতা আর গোড়ালি।

সে ছেলেটির দিকে ফিরে বলল, তুমি কেন কথা বলছ না, আমি জানি। তুমি একটা দেবদূত। ফেরেস্তা। তুমি এই মাত্র আকাশ থেকে নেমে এসেছ, তাই এখানকার ভাষা জানো না। তাই না ?

ছেলেটি দু-দিকে মাথা নাড়ল।

সোহিনী বলল, এর মানে কী ? ভাষা জানো ? তুমি দেবদূত না ?

ছেলেটি আবার দুদিকে মাথা নাড়ল, সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সোহিনীর মুখের দিকে।

সোহিনী বলল, বুঝেছি। আমি কে জানো ? আমি একজন পরী। আমিও আকাশ থেকে নেমে এসেছি। আমি উড়তে পারি। তুমি পারো ?

ছেলেটি এবার মাথা না দুলিয়ে, মুখে বলল-না।

সোহিনী বলল, এই তো মুখ দিয়ে কথা বেরিয়েছে। তা হলে মিস্টার দেবদূত, তুমি উড়তে শেখোনি কেন ? আমি শিখিয়ে দেব ? তুমি আমার পিঠে চাপতে পারবে ?

ছেলেটি আবার হেসে ফেলল।

তারপর বলল, আমি দেবদূত না, আমার নাম রাজা।

ও, রাজা। তা রাজামশাই, এখানে একা একা বসে আছ কেন ? তুমি কোথায় থাকো ?

ওই দিকে।

রাজামশাইয়ের সঙ্গে তো অনেক লোকজন থাকার কথা। জানো না, এই জঙ্গলে ভাল্লুক আছে, বাঘ আছে।

বাঘ নেই।

বাঘ নেই ? কিন্তু যদি ভাল্লুক এসে পরে ?

তুমিও তো একা একা এসেছ ?

আমি তো মেয়ে, ভাল্লুকরা মেয়েদের কিছু বলে না। তুমি সাঁতার জানো ?

না।

এ কি ! তুমি আকাশে উড়তে পারো না, সাঁতার জানো না। তা হলে রাজত্ব চালাবে কী করে ? আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। কোনটা আগে শিখবে বলো !

শুকনো পাতায় কারওর পায়ের শব্দ হতে সোহিনী পিছন ফিরে তাকাল।

প্যান্ট-শার্ট ও গামবুট পরা অভিমন্যু সরকার থমকে দাঁড়িয়েছে একটু দূরে। তার হাতে নানান ধরনের কয়েকটা গাছের চারা।

এক নজর দেখেই মানুষের চরিত্র অনেকটা বুঝতে পারে সোহিনী। এই লোকটি বিপজ্জনক নয়।

সে বলল, নমস্কার।

অভিমন্যু দারুণ অবাকভাবে বলল, এই ছেলেটি, মানে রাজা, আপনার সঙ্গে কথা বলছিল।

সোহিনী বলল, হ্যাঁ, তাতে কিছু দোষ হয়েছে নাকি ?

অভিমন্যু বলল, না, তা নয়। কিন্তু ....

রাজা বলল, আমি সাঁতার শিখব আগে।

সোহিনী তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এই ভদ্রলোককে চেনো ?

রাজা বলল, আমার বাবা।

অভিমন্যু বলল, প্রায় ছমাস ও একটাও কথা বলেনি।

সোহিনী বলল, তাই নাকি ? আমি তো ওর বন্ধু হয়ে গেছি, তাই আমার সঙ্গে গল্প করছিল। আপনি ওকে সাঁতার শেখাননি কেন ? জলের ধারে একলা বসে আছে। এখানে বেশ স্রোত।

অভিমন্যু উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল সোহিনীর দিকে। এখনও তার বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না।

যেন অনেক দিনের চেনা, এইভাবে সোহিনী জিজ্ঞেস করল, আপনার হাতে ওগুলো কী ?

অভিমন্যু বলল, কয়েক রকমের ফার্ন। আপনি, আপনাকে তো ...

সোহিনী বলল, আমাকে আগে দেখেননি, এই তো ? দেখবেন কী করে, আমি একজন পরী। আকাশ থেকে নেমে এসেছি। ঠিক আছে, এখন চলি।

রাজার গালে একটা টোকা মেরে বলল, তোমার বাবাকে বলো, সাঁতার শেখাতে। আমি আর একদিন এসে তোমাকে উড়তে শেখাব।

সে উঠে দাঁড়াল।

অন্য দিক থেকে দৌড়ে এল ললিতা আর ইমতিয়াজ। অনেকক্ষণ ধরে নায়িকার পাত্তা নেই। সবাই ব্যস্ত হয়ে গেছে।

শুটিং পার্টির সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিমতন গোলমাল লেগে গেল। স্থানীয় অধিবাসী মানে ঠিক স্থানীয় নয়, দু-তিন মাসের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে এখানে থাকতে এসেছে, অর্থাৎ চেইঞ্জার।

শুটিং ঝর্নার ধারে। লাইটিং হয়েছে, ক্যামেরা বসে গেছে। পাত্র-পাত্রীও তৈরি।

সোহিনীকে এখন চেনাই যায় না। সে সেজেছে ঐতিহাসিক আমলের এক রানি। অঙ্গে লাল মখমলের পোশাক, মাথায় পালক লাগানো মুকুট।

এ ফিল্মের কাহিনিতে নতুনত্ব আছে।

আধুনিক কালের গল্প।

নায়ক দেবশঙ্কর এক অতি সার্থক ও ব্যস্ত ডাক্তার। নায়িকা সোহিনী এক গরিব স্কুল শিক্ষকের মেয়ে। মেয়েটি প্রেমে পড়েছে ডাক্তারের। কিন্তু ডাক্তার তাকে পাত্তাই দেয় না। ডাক্তারের প্রেম-ট্রেম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই, সে চায় আরও সার্থকতা। অর্থাৎ আরও টাকা, আরও খ্যাতি। ইচ্ছে করলে সে কত ধনী কন্যাকে টুসকি দিয়ে ডাকলেই

কাছে পেতে পারে। এক সাধারণ স্কুল মাস্টারের মেয়েকে সে পাত্তা দেবে কেন ?

সোহিনী তবু ডাক্তারের কাছে বারবার আসে, অপমানিত হয়ে ফিরে যায়।

এর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ সোহিনী স্বপ্নের মধ্যে হয়ে যায় সুলতানা রিজিয়া। আর ডাক্তার দেবশঙ্কর হয়ে যায় এক হাবসি ক্রীতদাস। সে সুলতানা রিজিয়ার প্রেমে পড়ে পাগল, যতবারই তার কাছে আসে, সুলতানা তাকে পা দিয়ে ঠেলে দেয়।

পরিচালক রাকেশ খুব বদমেজামি মানুষ। তার থুতনিতে ফ্রেঞ্চ কাট অর্থাৎ ছাগল দাড়ি। শুটিং জোনের মধ্যে মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এ নিয়ম সে নিজেই জারি করেছে। অথচ সব সময়ই তার মনে হয়, কখন প্যাক আপ হবে, কখন সে বোতল থেকেই কাঁচা মদ গলায় ঢালবে। একেই বলে আত্মনিপীড়ন।

স্টার্ট সাউন্ড। ক্যামেরা !

রোলিং।

অ্যাকশন।

উঁচু পাথর থেকে রিজিয়ার বেশে নেমে আসছে সোহিনী। অহঙ্কারী ভঙ্গিতে চিবুক উঁচু করা। হাতে একটা তলোয়ার। সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জঙ্গলের দিকে।

অন্য একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সারা গায়ে আলকাতরা মাখা নায়ক দেবশঙ্কর। তার হাতে একটা স্থলপদ্ম (কাগজের)।

দেবশঙ্কর প্রথম ডায়ালগ দিতে যাবে, এমন সময় শুটিং জোনের মধ্যে ঢুকে পড়ল সাদা দাড়ি-চুলওয়ালা এক বৃদ্ধ। তার দু-পায়ে ঘুঙুর বাধা, হাতে লাঠি।

তিনি যেন আশেপাশে কী ঘটছে তা কিছুই দেখছেন না, সোজা এগিয়ে যাচ্ছেন ঝর্নার দিকে।

সবাই হতবাক। এ আবার কে ?

রাকেশ চেঁচিয়ে উঠল, কাট ! কাট !

বলাই বাহুল্য, এই বৃদ্ধ আমাদের পূর্ব পরিচিত রঙ্গলাল। রোজ বিকেলে তিনি এই ঝর্নার জল মাথায় ছিটোতে আসেন। মর্নিং ওয়াকের বদলে আফটার নুন ওয়াক।

শুটিং-এর সময় যাতে গন্ডগোল না হয়, সেই জন্য রাখা হয়েছে চারজন সশস্ত্র সেপাই। এখানে অবশ্য তেমন ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দু-পাঁচজন মালি, গয়লা আর কাজের লোক জড়ো হয়েছে। এখানকার চেইঞ্জাররা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, তারা চিত্র তারকাদের দেখার জন্য আদেখলাপনা করে না।

প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্টদের চোখ এড়িয়ে কী করে ভিতরে ঢুকে এল এই বৃদ্ধ ?

রাকেশ রাগ করে মাথার টুপিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।

প্রোডাকশনের একটি ছেলে ছুটে এসে রঙ্গলালের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, দাদু, এটা কী করলেন ?

রঙ্গলাল মিষ্টি করে হেসে বললেন, তুমি আমায় দাদু বলে ডাকলে। তা আমি তোমার মায়ের বাবা, না বাবার বাবা, তা তো ঠিক মনে পড়ছে না।

এখন রসিকতা করার সময় নয়। ছেলেটি ব্যস্তভাবে বলল, দেখছেন না এখানে শুটিং চলছে ?

রঙ্গলাল একই রকম মিষ্টি গলায় বললেন, তোমাদের কী হচ্ছে না হচ্ছে, তা আমাকে দেখতেই হবে কেন ?

ছেলেটি এবার রঙ্গলালের পিঠে হাত দিয়ে বলল, এখান থেকে সরে যান, সরে যান।

রঙ্গলাল এবার বোমা ফাটার মতন প্রচণ্ড জোরে বললেন, তুই আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন রে হারামজাদা ? তোর এত সাহস।

একজন সেপাই এসে বলল, হঠ্‌ যাইয়ে ! হিঁয়াসে হঠ্‌ যাইয়ে।

রঙ্গলাল বললেন, কেন হঠে যাব ? আমি এ সময় রোজ ঝর্নার কাছে আসি। আমায় কে আটকাবে ? এটা গভর্নমেন্টের জায়গা।

আউটডোরে এসে জনসাধারণের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হয়। তারা ক্ষেপে গেলে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া যত সময় নষ্ট হবে, ততই খরচ বাড়বে। টাইম ইজ মানি।

মেজাজ সামলে কাছে এসে রাকেশ হাত জোড় করে বলল, স্যার, এখানে একটা ফিল্মের শুটিং করছি, যদি দয়া করে একটু সরে যান।

রঙ্গলাল বললেন, আপনি শুটিং মুটিং কী করছেন, তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ? আমি কেন ঝর্নাটার পাশে যেতে পারব না ?

রঙ্গলাল এমন ভাব করছেন, যেন তিনি শুটিং-এর ব্যাপার কিছুই জানেন না। আসলে তিনি কৌতুক বোধ করছেন ভিতরে ভিতরে। এখানকার নিস্তরঙ্গ জীবনে কোনও বৈচিত্র নেই, ছবি অন্য কারওর সঙ্গে প্রেম করে না। তাঁকে বিষ খাওয়াবারও চেষ্টা করে না। মনে হয় যেন তাঁকে সত্যিই ভালবাসে।

এখানে তবু একটা মজা হচ্ছে বেশ। তিনি যেন এক ঝগড়াটে প্রজার ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

ওপর দিকের পাথরে দাঁড়িয়ে সুলতানা-বেশী সোহিনী মিটিমিটি হাসছে।

এবার সে নীচে নেমে এসে রঙ্গলালকে জিজ্ঞেস করল, আপনি পায়ে ঘুঙুর পরেন কেন ? নাচেন বুঝি ?

রঙ্গলাল বললেন, হ্যাঁ, নাচতেও পারি।

কার কাছে নাচ শিখেছেন ?

এক চানাচুরওয়ালার কাছে।

এবারে প্রোডাকশনের লোকেরা পর্যন্ত হেসে ফেলল।

সোহিনী বলল, এনার চেহারাটা ভারি সুন্দর। সাদা চুল দাড়িতে ভাল মানিয়েছে। পারফেক্ট ওল্ড ম্যান।

পরিচালকের দিকে ফিরে বলল, এঁকে আমাদের এই শটে নিয়ে নাও না। কেলেকুট্টি হিরোর পাশ দিয়ে এই ফর্সা বৃদ্ধটি হেঁটে যাবে, চমৎকার কনট্রাস্ট হবে। একটা দুটো ডায়ালগও দেওয়া যেতে পারে।

রাকেশ কিছু না বলে কাঁধ ঝাঁকালেন। সে সোহিনীর তৃতীয় স্বামী হলেও হতে পারে, এ রকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সুতরাং সোহিনীর কোনও কথায় সে আপত্তি জানাতে পারে না।

সোহিনী রঙ্গলালের দিকে ফিরে বলল, আমার মায়ের বাবাকে দেখতে অনেকটা আপনার মতন ছিল। আপনাকে আমি দাদু বলবই বলব। দাদু, আপনি আমাদের সিনেমায় পার্ট করবেন।

এবারে লজ্জা পেয়ে গেলেনে রঙ্গলাল।

তিনি বললেন, ধ্যাৎ ! ঠিক আছে, আমি সরে যাচ্ছি।

সোহিনী তার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আপনি না বললে শুনব না। আপনাকে পার্ট করতেই হবে।

রঙ্গলাল বললেন, তোমাদের সিনেমা মানে তো জানি বারবার পিছন ফিরে পাছা দোলানো নাচ। ও আমার দেখতেও ভাল লাগে না।

সোহিনী নাচের মুদ্রায় দু-হাত জড়িয়ে বলল, পিছন দিকটা দেখতে ভাল লাগে না ? তা হলে, এই যে, সামনের দিকটা ?

দেবশঙ্কর বিরক্তভাবে বলল, এ সব কী হচ্ছে ? কতক্ষণ সঙ সেজে থাকব ? আমি মেক আপ তুলে ফেলব।

রঙ্গলাল প্রায় ছুটে গিয়ে ঝর্না থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে বললেন, চালাও, তোমরা যা করছিলে, চালাও।

তিনি শুটিং জোন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ছবি।

সে যেন আজ একটু বেশি বেশি সেজেছে। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, লাল শাড়ি। রঙ্গলাল কাছে আসতেই সে বিমুগ্ধভাবে বলল, সোহিনী তোমার হাত ধরেছিল।

রঙ্গলাল বললেন, হ্যাঁ। কেন, তাতে কী হয়েছে। আমার হাত ধুয়ে ফেলতে হবে নাকি ?

ছবি বলল, যাঃ, কী যে বলো। কত লোক ওকে একটু ছুঁতে পারলে ধন্য হয়ে যায়।

কেন, খুব দামি মেয়ে বুঝি ?

তুমি ওর 'লাল আকাশ' দেখোনি ?

সিনেমা ? নীল সিনেমা ছাড়া আমার অন্য কিছু ভাল লাগে না।

নীল সিনেমা ?

হ্যাঁ। হিন্দি সিনেমাও সিকি পরিমাণ নীল, আর বাংলাতে কিছুই থাকে না।

ও, বুঝেছি। আচ্ছা, ওই সব ফিল্মকে নীল বলে কেন ?

তা জানি না।

সোহিনী তোমার সঙ্গে কথা বলল, একদিন আমাদের বাড়িতে চা খেতে আসতে বলতে পারতে। তা হলে ওর সঙ্গে আমি আলাপ করতে পারতাম।

এক্ষুনি আলাপ করে আয় না। ওইখানে ওই ক্যামেরার সামনে ঢুকে পড়। সরাবার চেষ্টা করলে সরবি না। তোকে একটা পার্টও দিয়ে দিতে পারে।

যাঃ, ওরকম অসভ্যতা আমি করতে পারব না।

তা হলে আমি যা করলাম, সেটা অসভ্যতা ?

তোমাকে মানায়। তুমি যা করবে, তাই-ই তোমাকে মানায়।

রঙ্গলাল ছবির পিঠে হাত রেখে বললেন, বউয়ের কাছ থেকে কমপ্লিমেন্ট পেতে কী মিষ্টিযে লাগে !

ললিতা জিজ্ঞেস করল, এ ছেলেটি কে ?

সোহিনী বলল, ওর নাম রাজা। ও আকাশে উড়তেও জানে না, জলে সাঁতার কাটতেও জানে না। আমি ওকে উড়তে শেখাব বলেছি।

ললিতা অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে ভুরু তুলে বলল, ও এই বয়েসেই উড়তে শিখবে কী রে ? আর একটু বয়েস হোক।

তুই কত বয়েসে উড়তে শিখেছিস রে ললিতা ?

তা উনিশ তো হবেই। কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। এক রাতে বাড়ি ফিরিনি।

কার সঙ্গে উড়লি ? মামাতো-পিসতুতো ভাইটাই ?

যাঃ। একটা ইয়েলো রঙের স্পোর্টস কার হাঁকিয়ে ঘুরত। পুলিশ কমিশনারের ছেলে ইন্দ্রজিৎ দুবে। দারুণ হ্যান্ডসাম। প্রথম প্রথম রাজি হইনি, তারপর একদিন ওর গাড়িতে উঠতেই ...

কোথায় নিয়ে গেল ? গোয়া ?

না, পুনায় ওদের একটা বাগান বাড়ি ছিল। সেখানে ওদের আরও তিনজন বন্ধু, তাদের গার্ল ফ্রেন্ড, আমার এমন ভয় করছিল, ঝোঁকের মাথায় --

বুঝেছি। সেই ইন্দ্রজিৎ দুবে তো পরে মালাবার হিলসে খুন হয়ে গেল। ততদিনে তুই এ লাইনে এসে গেছিস ?

হ্যাঁ, একটা ছোট রোল পেয়েছিলাম শ্যাম বেনেগালের ছবিতে। তুই খুব লাকি, সোহিনী, প্রথম ফিল্মেই হিরোইন।

সে চান্স না পেলে আমি মরেই যেতাম বোধহয়। এক ইবলিশের বাচ্চার সঙ্গে আমার প্রথম বিয়ে হয়েছিল, মাত্র চোদ্দ বছর বয়েসে, আমাকে মারত -- উঠে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা চকোলেটের বার হাতে নিল সোহিনী।

একটা চেয়ারে কাঠের পুতুলের মতন স্থির হয়ে বসে আছে রাজা। তার দৃষ্টি শুধু সোহিনীর দিকে।

সোহিনী চকোলেটটা রাজাকে দিয়ে বলল, এই আমার লেটেস্ট বয়ফ্রেন্ড। কী ফেইথফুল দেখ, সব সময় আমার সঙ্গে লেগে আছে।

ললিতা বলল, নয় থেকে নব্বই সব পুরুষই তোর অ্যাডমায়ারার।

সোহিনী হেসে ফেলে বলল, কাল শুটিংয়ের মাঝখানে এক ধপধপে দাড়িওয়ালা বুড়ো, সে কিন্তু আমায় পাত্তা দেয়নি। বোধহয় আমাকে চেনেই না।

ললিতা বলল, তুই একটু চেষ্টা করলেই ওই বুড়োর মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারিস।

সোহিনী বলল, আপাতত আমি আমার এই বাচ্চা বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে মজে আছি। জানিস, এ নাকি সাড়ে চার মাস ধরে একটাও কথা বলেনি। শুধু আমার সঙ্গে কথা বলেছে।

সে কি, কথা বলত না? কেন?

ইচ্ছে হয়নি। আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে দিনের পর দিন কথা না বলে ... রাজা, তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

রাজা বলল, বাবা।

আর কেউ না?

না।

মা নেই। তোমার মা কোথায়?

রাজা আবার চুপ করে রইল।

সোহিনী তাকাল ললিতার দিকে।

ললিতা বলল, আমাদের এখন রেডি হতে হবে না?

সোহিনী বলল, এ বেলা আমার নেই। আমি এখন রাজাদের বাগান দেখতে যাব। ওদের বাগানে নাকি কাঁঠালি চাঁপার গাছ আছে। সে ফুল আমি কখনও দেখিনি।

ললিতা বলল, আমি দেখেছি। দারুণ গন্ধ।

রাজা এর মধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। দরজার কাছে গিয়েও পিছন ফিরে সোহিনী বলল, তোরা কিন্তু আমার পিছন পিছন আসবি না। ওই ইমতিয়াজটাকে বারণ করবি, যেন খুঁজতে না যায়। আমি হারিয়ে যাব নাকি?

রাজার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল সোহিনী।

আজ আকাশ মেঘলা। হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়তে পারে, তাই আজ ইনডোরে শুটিং-এর ব্যবস্থা চলছে। সেট তৈরি হচ্ছে দোতলার টানা বারান্দায়। বাতাসে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব।

হাঁটতে হাঁটতে সোহিনী জিজ্ঞেস করল, রাজা, তোমাদের কে রান্না করে গো?

রাজা বলল, ফুলমণি। বাবাও রান্না করে। বাবা মাংস রাঁধে।

তাই নাকি ? তোমার বাবার রান্না আমাকে খাওয়াবে না ?

এখানে রোজ মাংস পাওয়া যায় না।

তোমার বাবা রান্না ছাড়া আর কী কী পারে ?

অঙ্ক পারে। বাবা সব অঙ্ক জানে। আর বাঁশি বাজাতে জানে।

বাঃ, অঙ্ক পারে, আবার বাঁশি বাজাতেও পারে ? তোমাদের বাড়ি কোথায় ? কলকাতায় ?

না। জামসেদপুরে।

হঠাৎ থমকে গেল সোহিনী।

একটু দূরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে পরিচালক রাকেশ। তারপর কথা শেষ করে সে হেঁটে আসতে লাগল এদিকেই।

সোহিনী বলল, এই, এই, চলো, আমরা লুকিয়ে পড়ি।

বড় বড় গাছের মাঝে মাঝে রয়েছে কিছু আগাছার ঝোপ। রাজার হাত ধরে টেনে নিয়ে সোহিনী একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল।

রাকেশ সেই ঝোপটার কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সে অবশ্য ওদের দেখতে পায়নি।

পকেট থেকে একটা ব্র্যান্ডির পাঁইট বার করে চুমুক দিল একটা।

রাকেশ একসঙ্গে অনেকটা মদ্যপান করে নেশা করে না। সারা দিন ধরে যখনই সময় পায়, তখনই একটু একটু চুমুক দেয়। অনেকে বুঝতেই পারে না।

আরও একটা চুমুক দিয়ে সে প্যান্টের জিপ খুলে ফেলল। তারপর ছেড়ে দিল ছড়ছড় করে।

ঘেন্নায় নাক কুঁচকে গেল সোহিনীর। কিন্তু এখন এখান থেকে সরে যেতে গেলে রাকেশ দেখে ফেলতে পারে।

রাজা হেসে ফেলতে যাচ্ছিল। সোহিনী তাকে চেপে ধরে মুখে হাত চাপা দিল।

কাজ সেরে চলে গেল রাকেশ।

রাজা জিজ্ঞেস করল, ও লোকটা কে ?

সোহিনী বলল, ও আমাদের টিমের একজন।

রাজা আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি ওকে ভয় পাও কেন ?

সোহিনী এর উত্তর না দিয়ে একটু হাসল।

ইদানীং রাকেশ তার খুবই প্রেমে পড়েছে, তাকে ভয় পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখন রাকেশের সঙ্গে কথা বলতে তার ইচ্ছে করছিল না।

রাকেশের চোখে পড়ে গেলে অনেকক্ষণ কথা বলতে হত। তাতে অধৈর্য হয়ে উঠত না রাজা ? তার হিংসেও হতে পারত। এমনকী রাজাকে দেখে রাকেশেরও হিংসে হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

বাগানে হাঁটু গেড়ে বসে আগাছা তুলছে অভিমন্যু। পাজামা পরা, খালি গা।

রাজাকে আগে সে চোখের আড়াল হতে দিত না, এখন সে জানে, ফিল্মের নায়িকটির কাছে গিয়ে রাজা বসে থাকে। তাতে আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না, ওই রমণীটিই তার ছেলের মুখে কথা ফুটিয়েছে।

কী করে পারল ? আগে কত চেষ্টা করা হয়েছে। ডাক্তাররাও সুবিধে করতে পারেনি।

অনেকেই জিজ্ঞেস করে রাজার মা কোথায় ?

বাঙালিদের বোধহয় কৌতূহল প্রবৃত্তিটা বেশি। আর সেটা চেপে রাখতেও পারে না। ছেলে আছে, বাবা আছে, আর মা থাকবে না?

মা তো মরে যেতেও পারে।

যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই প্রচুর সহানুভূতি পাওয়া যেত। এই বয়েসে মাতৃহীন।

কিন্তু মালবিকা বেঁচে আছে। এমনকী বিবাহ-বিচ্ছেদও হয়নি তার সঙ্গে। সে অমলের কাছে চলে গেছে। অভিমন্যুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমল।

কেন মালবিকা চলে গেল, তার কোনও কারণ আজও খুঁজে পায়নি অভিমন্যু। সবাই জানত, ওরা একটা সুখী, মানানসই দম্পতি, ওদের একটি মাত্র সন্তান, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান।

ছেলেকেও ভালবাসতে পারেনি মালবিকা?

অফিসের কাজে দু-দিনের জন্য দিল্লি গিয়েছিল অভিমন্যু, যাওয়ার আগে মালবিকার সঙ্গে তার ঝগড়াঝাঁটিও হয়নি, বরং মালবিকা দিল্লি থেকে টুকিটাকি দু-একটা জিনিস আনার কথা বলেছিল। কী এমন ঘটতে পারে এই দুদিনের মধ্যে?

ফিরে এসে দেখল, মালবিকা নেই। একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি রেখে গেছে।

'আমি অমলের কাছে চলে যাচ্ছি। আমার পক্ষে কিছুতেই অমলকে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। তোমরা আমাকে যদি পারো তো ক্ষমা করো।'

রাজাকেও কিছু বলে যায়নি মালবিকা। সে রাত্তিরে মায়ের পাশেই ঘুমিয়ে ছিল। সকালে উঠে আর মাকে দেখতে পায়নি।

প্রথম দিনটাই শুধু কেঁদেছিল রাজা। তারপর থেকেই তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। বালকের সেই তীব্র অভিমান, এতদিনেও সে ভাঙতে পারেনি।

অমল থাকে কানপুরে।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে কম্পিউটার ট্রেনিং স্কুল চালাচ্ছে। নতুন ব্যবসা, নিশ্চয়ই খুব খাটতে হয়। মালবিকা তো কম্পিউটারের কিছুই বোঝে না। সে কি সাহায্য করবে?

মালবিকা চলে যাওয়ার ঠিক দুমাস পরে ছিল রাজার জন্মদিন। ঠিক আগের দিন কুরিয়ার সার্ভিসে একটা বড় প্যাকেট এসে ছিল। রাজার জন্য এক প্রস্থ নতুন পোশাক।

প্যাকেটটি খোলার পর অভিমন্যু কিছু না বলে সেটা তুলে দিয়েছিল রাজার হাতে। ভিতরে কোনও চিঠি কিংবা কার্ড নেই। রাজা সব শুদ্ধু প্যাকেটটা নিয়ে ফেলে দিয়েছিল রাস্তায়। তখনও মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করেনি।

অভিমন্যু তার মন থেকে মালবিকাকে মুছে ফেলতে পারে। কিন্তু একটা শিশু কী করে ভুলে যাবে তার মাকে। ঠিক শিশুও তো নয়, রাজার বয়েস দশ বছর, এই বয়েসে সব কিছু মনে থাকে ?

কোনও মেয়ের দিকেই এখন আর তাকাতে ইচ্ছে করে না অভিমন্যুর। মালবিকা তাকে চরম অপমান করে গেছে। প্রথম প্রথম রাগে, ঘেন্নায় তার মনে হত, কানপুরে গিয়ে মালবিকা আর অমল এই দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলবে। সে কল্পনায় দেখতে পেল, হিন্দি সিনেমার ভিলেনের মতো বিকৃত গলায় চিৎকার করতে করতে মালবিকার গলা টিপে ধরেছে, দম বন্ধ অবস্থায় ছটাফট করছে মালবিকা, একটা চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা অমল ...।

ওসব কোনওদিনই করা সম্ভব নয় অভিমন্যুর পক্ষে। এই ধরনের মানুষরা নিজেরা যতই কষ্ট পাক, অন্যদের কষ্ট দিতে পারে না। কারওর গায়ে হাত তোলাই অভিমন্যুর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু নরম স্বভাবের লোকরাও এই রকম বীভৎস দৃশ্য কল্পনা করে। আর যারা সত্যি সত্যি এই সব কাণ্ড করে, তারা বোধহয় কল্পনার ধার ধারে না।

এখানকার সিনেমা পার্টির এই নায়িকাটি যতই রূপসী হোক, তার প্রতিও কোনও আকর্ষণ বোধ করেনি অভিমন্যু। তার জীবনে এখন কোনও নারীর স্থান নেই। কিন্তু এই নারীটি প্রায় জাদুকরীর মতন রাজার মুখের ভাষা ফিরিয়ে দিয়েছে।

রাজাকে নিয়ে সোহিনী যখন বাগানে ঢুকল, সেদিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েও অভিমন্যু মাটি খোড়ায় মন দিল।

পর পর তিনটি গাছে বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে। এখানে এক মাস থাকতে থাকতেই বাগান করার নেশায় পেয়েছে অভিমন্যুকে। অবশ্য মালি এসেও সাহায্য করে।

কাছে এসে সোহিনী একটুক্ষণ অভিমন্যুর মাটি খোঁড়া দেখে জিজ্ঞেস করল, এটা কী

ফুল ?

অভিমন্যু ভুরু কুঁচকে বলল, চন্দ্রমল্লিকা, আপনি চেনেন না ?

সোহিনী বলল, আমি কোনও গাছই চিনি না। তবে চন্দ্রমল্লিকার নাম শুনেছি। আর একটা আছে সূর্যমুখী, তাই না ? তাও শুধু নাম জানি।

অভিমন্যু দূরে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওইটা সূর্যমুখী।

সোহিনী বলল, একই জায়গায় চন্দ্র আর সূর্য, বাঃ। আর কাঁঠালি চাঁপা কোনটা ? এই নামটা খুব ইন্টারেস্টিং, একই সঙ্গে কাঁঠাল আর চাঁপা, আমি চাঁপা ফুল চিনি। কাঁঠাল বিচ্ছিরি দেখতে আর চাঁপা, একজন বলেছিল আমার আঙুলের মতন।

অভিমন্যু বলল, কাঁঠালি চাঁপা এ বাগানে নেই।

সোহিনী বলল, সে কি ? রাজা যে বলল, আছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের বাগানে কী কী ফুল আছে ? ও গড়গড় করে অনেকগুলো নাম বলে গেল, তার মধ্যে কাঁঠালি চাঁপা নামটা আমার কানে লাগল। কী গো রাজা ?

রাজা লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করেছে।

অভিমন্যু বলল, হয়তো অন্য কোনও বাগানে দেখেছে। কাঁঠালি চাঁপা মোটেই কাঁঠালের মতন দেখতে নয়, চাঁপা ফুলেরও মিল নেই। পাপড়িগুলো মোটা মোটা আর মাত্র তিন-চারটে, আর মৃদু গন্ধ আছে।

সোহিনী জিজ্ঞেস করল, আপনার চা খাওয়া হয়ে গেছে ?

অভিমন্যু বলল, হ্যাঁ।

সোহিনী মুখটা নিচু করে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার চা খাবার পর বাড়িতে অতিথি এলে বুঝি তাকে চা খাওয়ান না ?

অভিমন্যু প্রথমে ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, কী বললেন ? ও হ্যাঁ। আপনি চা খেতে চান ?

শোহিনী হেসে বলল, হ্যাঁ। আমি চায়ের ভিখিরি।

খুরপিটা রেখে হাতের ধুলো মাটি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল অভিমন্যু। তখন তার মনে পড়ল, সে খালি গায়ে আছে। কোনও বাইরের মহিলার সামনে পুরুষরা খালি গায়ে থাকে না।

সে আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর হাত রাখতেই সোহিনী আরও হেসে বলল, এক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে আপনার জামা পরার দরকার নেই। আমরা তো ফিল্মের লোক, পুরুষদের সব রকম ভাবে দেখতে অভ্যস্ত।

তবু অভিমন্যু ছেলেকে বলল, রাজা, দৌড়ে আমার একটা জামা নিয়ে আয় তো। আর দ্যাখ ফুলমণি আছে কি না।

সেই লজ্জাটা মেয়েদের জিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বংশ পরম্পরায় লজ্জাটা আরও বাড়ছে। আমি যদি খালি গায়ে ঘুরে বেড়াই, আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। আমার মা বোরখা না পরে কখনও বাড়ি থেকে বেরোননি। যাক গে, আপনি ভাল মাংস রান্না করতে পারেন, তা জানি। আপনি চা বানাতেও পারেন ?

হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তনে হকচকিয়ে গিয়ে অভিমন্যু বলল, আমি মাংস রান্না করতে পারি, কে বলল আপনাকে ? রাজা ? রাজার সঙ্গে আপনার এত গল্প হয় ? অথচ আগে ও কারওর সঙ্গেই ...

ওর মায়ের সঙ্গে কি আমার কোনও মিল আছে ?

একটুও না।

জানতুম। আচ্ছা, ওর মা তো বেঁচে আছেন।

আপনি তা জানলেন কী করে ? এটাও রাজা বলেছে ? কোনওদিন একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

না। এটা রাজা বলেনি। মায়ের কথা জিজ্ঞেস করলেই ও চুপ করে থাকে। কিন্তু যে ছেলের মা নেই, মায়ের কথা শুনলেই তার মুখে একটা ছায়া পড়ে। আমি ওর মুখে সেই ছায়া দেখিনি। বরং যেন চাপা রাগের ঝলসানি।

কী বলছেন আপনি ? আপনি এত সব লক্ষ করেন ?

সিনেমার লাইনে না এলে আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করতুম। মানুষের মুখের রেখা লক্ষ করতে আমার খুব ভাল লাগে। ভুরু একটু উঁচু নিচু হলে বোঝা যায় মুড বদলে যাচ্ছে।

চলুন, ভিতরে চলুন।

অভিমন্যুবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না ? আপনার স্ত্রীকে আপনি ত্যাগ করেছেন, না তিনি নিজে কোথাও চলে গেছেন ?

আমার স্ত্রী কোনও কারণ না দেখিয়ে আমার এক বন্ধুর কাছে গিয়ে থাকছেন। এখন কানপুরে।

আপনি কী ধরনের মানুষ ? খুব রাগী ?

আমার সম্পর্কে এ কথা কেউ বলেনি কখনও। আপনি যদি জানতে চান, আমার স্ত্রীর সঙ্গে খুব রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি হয়েছে কিনা, তা হলে বলল, না। সে রকম কখনও হয়নি। কখনও কখনও সাধারণ কথা কাটাকাটি, একটু বকাবকি, তা তো সব ফ্যামিলিতেই হয়।

আপনি মদ খান ?

কখনও কখনও খাই তো বটেই। কিন্তু যাকে মদ খাওয়া বলে, রোজ রোজ নেশা করা, তা আমার ধাতে নেই। এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

রাজা এসে পড়বার আগেই আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আপনি একটু কাছে আসুন।

সোহিনী তার ঘাড়ের কাছের চুল উঁচু করে ধরল। তার ঘাড়ে দুটো গোল গোল কালো দাগ। পুরোনো, কিন্তু তার ফর্সা তনুতে দাগ দুটো খুব প্রকট।

সোহিনী বলল, কোনও ফিল্মে আমার ঘাড় দেখানো হয় না। এই দাগ দুটো কীসের জানেন ? আমার প্রথম হাজব্যান্ড আমার ঘাড়ে এই রকম জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিত। সব সময় সন্দেহ করত আমাকে, তাই নানা রকম অত্যাচার করত। আমি তখন একটা সরল, বোকা বোকা মফঃস্বলের মেয়ে, এই পড়ার জগৎ ছাড়া বাস্তব সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। অনেকে বলত, আমি নাকি সুন্দর, কিন্তু নিজে ঠিক বুঝতুম না। আমার সেই হাজব্যান্ডের অত্যাচারে একদিন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলুম। তারপর অনেক ঘাট ঘুরেছি, সে সব আর বলতে চাই না। হয়তো মরে যেতেও পারতুম। খুব রিস্‌ক ছিল, কিন্তু এখন আমি স্বাধীন, জানেন ? এখন আমি ইচ্ছে মতন জীবনটা উপভোগ করতে পারি, ভোরবেলা বৃষ্টি গায়ে মাখি, রাত্তির বেলা একা একা বসে থাকি জানলার ধারে ..

অভিমন্যু বলল, আপনি এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন ?

সোহিনী বলল, কী জানি। হঠাৎ মনে এল। আপনার স্ত্রীর মতন আমিও স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম।

অভিমন্যু কড়া গলায় বলল, আমি সিগারেট খাই না। কোনও মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার মতন বর্বরতা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

সোহিনী বলল, তবু একটা কিছু কারণ তো ছিল নিশ্চয়ই।

আমি এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না আপনার সঙ্গে।

আপনি রেগে যাচ্ছেন। তা বলে কি চা খাওয়াবেন না ?

হ্যাঁ, চলুন ভিতরে। আমার ছেলের সঙ্গে আপনার ভাব হয়েছে। আপনাকে আমি অবশ্যই খাতির করব। কিন্তু আপনি দয়া করে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাবেন না।

সোহিনী দুলে দুলে হাসতে লাগল।

রাজা বারান্দায় এসে বলল, বাবা, তোমার দুটো জামা কেচে দিয়েছে, শুকোয়নি। আলমারি বন্ধ।

ভিতরে ঢুকে গেল অভিমন্যু।

ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। গায়ে একটা গেঞ্জি।

সে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনার কোনও ছেলে ছিল ?

সোহিনী বলল, না।

অভিমন্যু বলল, স্বামীর ওপর রাগ থাকতে পারে, কিন্তু ছেলেকে ছেড়েও কেউ কী করে চলে যায় ...। আপনি আমার ছেলেকে নিতে চান ? নিয়ে যান।

সোহিনী এগিয়ে এসে অভিমন্যুর হাত ছুঁয়ে বলল, আপনাকে আমি রাগিয়ে দিয়েছি, আমি দুঃখিত।

সন্ধেবেলাতেই এল সেই চরম দুঃসংবাদ।

এখানে টিভি নেই, টেলিফোন নেই সব বাড়িতে। রেডিও আছে, তাও কেউ মন দিয়ে শোনে না। কাছাকাছি একটা ছোট শহর যোলো কিলোমিটার দূরে, প্রোডাকশন ম্যানেজার শশী সেখানে গিয়েছিল কিছু জিনিসপত্র কিনে আনবার জন্য।

সেখানে নাকি একটা ওষুধের দোকানে (সে দোকানে মদের বোতলও পাওয়া যায়) বসে রেডিওর খবর শুনেছে।

বেনারসের কাছে একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জগৎ শা-র। তাঁর স্ত্রী আর ছোট ছেলেটিও গাড়িতে ছিল, কেউ বেঁচে নেই।

শশী সেখান থেকে মুম্বাইতে টেলিফোন করেও জেনেছে যে খবরটি সত্যি।

জগৎ শা এই ছবির প্রোডিউসার।

শশীর মুখে খবরটা শুনে রাকেশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল, তারপর শুয়ে পড়েই কয়েক মিনিটের জন্য অজ্ঞান। শুধু প্রযোজক নন, জগৎ শা রাকেশের কাকা।

এরপর আর শুটিং চালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এ ছবির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে গেল। তা ছাড়া জগৎ শা-র শেষকৃত্যের সময় রাকেশকে উপস্থিত থাকতেই হবে। এখন সম্পত্তি ভাগাভাগিরও প্রশ্ন আছে।

সুতরাং, প্যাক আপ। প্যাক আপ।

দুটি গাড়ি সব সময় মজুত থাকে, ব্যবস্থা হয়ে গেল আরও দুটি গাড়ির। বেরিয়ে পড়তে হবে ভোর রাতে।

সবাই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল। আজ আর রাত্তিরে কারওর ঘুম হবে না। জগৎ শা মুম্বাইয়ের ফিল্ম-মহলে হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি। আরও বেশ কয়েকটি ছবিতে তাঁর টাকা ঢালা আছে, এখন প্রচুর সোরগোল হবে।

সে নিজের ঘরের বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে একটা বই পড়ছে। আজ সারা রাত তার শুটিং হওয়ার কথা ছিল। এখন তার ছুটি।

ললিতা ঘরে ঢুকে বলল, ছি ছি ছি, কী কাণ্ড !

সোহিনী মুখ তুলে তাকাল।

ললিতা আবার বলল, আজ শুটিং হবে না বলে সবাই ঢক ঢক করে মদ গিলতে বসে গেছে !

সোহিনী বলল, কাজ হবে না, এখন ওদের যদি ইচ্ছে হয়, তাতে আপত্তির কী আছে ?

ললিতাকে কেউ একজন বলেছিল, তার মুখে ভাল এক্সপ্রেশন ফোটে না বলে সে বড় পার্ট পায় না। সেই জন্য ললিতা এখন কথা বলার সময় যখন তখন ভুরু তোলে, ঠোঁট কাঁপায়, থুতনিতে আঙুল ছোঁয়ায়।

সে চোখ বড় বড় করে বলল, বাঃ, একজন লোক মারা গেছে, অত বড় একজন মানুষ --

সোহিনী বলল, অত বড় মানে কি মহাপুরুষ ?

তুই কী বলছিস ? ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের একজন জায়ান্ট !

জায়ান্ট মানে তো মহাপুরুষ নন। রাকেশ ছাড়া উনি আমাদের কারোর আত্মীয়, স্বজন বা প্রিয়জনও নন। আমাদের সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক। মারা গেছেন সেটা দুঃখের কথা, তা বলে বসে বসে তার জন্য শোক করাও তো মোটেই স্বাভাবিক নয়।

তুই সব সময় বেশ গুছিয়ে কথা বলিস সোহিনী। ওই জগৎ শা-কে আমি কিন্তু দেখেছি। দেখেছি, মানে, চিনতাম।

ওর সঙ্গে হোটেলে থেকেছিস ?

বাঃ, কী যে বলিস !

অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় করার কী আছে ? আমাকে ও তো ইঙ্গিত দিয়েছিল। তখনই আমি রটিয়ে দিলুম, রাকেশের সঙ্গে আমার আশনাই চলছে।

রটিয়ে দিয়েছিস ? সত্যি সত্যি হয়নি।

আমাদের জীবনে আর সত্যি বলে কিছু আছে নাকি ? সবই তো মিথ্যে ? গরিবের মেয়ে, সুলতানা রিজিয়া, পরের ছবিতে মেয়ে পুলিশ-অফিসার, তারপর লক্ষ্মৌ-এর বাইজি, এর মধ্যে আমার নিজের পরিচয় কোনটা ?

তুই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিবি না ?

নাঃ। আমি যাব না ভাবছি।

যাবি না মানে ? কোথায় থাকবি !

এই বাড়িটা তো আরও সাতদিনের জন্য ভাড়া নেওয়া আছে।

অ্যাঁ ? তুই এখানে একলা থাকবি ? পাগল হয়েছিস নাকি ?

পাগলরা বুঝি একলা থাকে ? ওই জগৎ শা-র ফিউনারালে গিয়ে আমার চোখের জল ফেলতে হবে, আমার একদম ইচ্ছে করছে না।

চোখের জল ফেলা তো আমাদের পক্ষে সব থেকে সহজ।

তুই গিয়ে খুব কান্নার এক্সপ্রেশান দে, তোর অনেক ছবি উঠবে। ললিতা, ওই জানলাটা খুলে দে তো। আজ চাঁদ উঠবে।

তুই সত্যি যাবি না ?

না।

ললিতা ঝট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটু বাদে তার বদলে ফিরে এল ইমতিয়াজ। তার হাতে একটা গেলাস ভর্তি রাম।

সোহিনী তাকে দেখেই বলল, ওই দরজার কাছে দাঁড়াও, আর এগোবে না।

ইমতিয়াজ থমকে গিয়ে বলল, ম্যাডাম, কী শুনছি ? ললিতা গিয়ে যা বলল --

সোহিনী বলল, একটা বই পড়ছি, এত লোক এসে কথা বলছে, দু-পাতা এগোতে পারছি না। হ্যাঁ, যা শুনেছো, তা সত্যি। আমি যাচ্ছি না।

ইমতিয়াজ অভিনয় করে না, সে পরিচালকের সহকারী, তার মুখে ফুটে উঠল খাটি বিস্ময়। সে বিহ্বলভাবে বলল, কেন ?

সোহিনী বলল, আমার ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছে করছে না ?

হ্যাঁ, আমার ইচ্ছের বুঝি কোনও মূল্য নেই ?

এখানে ... একা একা ...

একাকি তো থাকতে চাই। প্রোডাকশনের জগলুল আর আলি আমার দেখাশুনো করবে। ওদের তো এখন না ফিরলেও চলবে। আমি ওদের পেমেন্ট করে দেব।

সোফি, তুমি বুঝতে পারছ না।

ইমতিয়াজ, আমি তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি, তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে না। আমাকে তুমি করেও বলবে না।

আই অ্যাম সরি, আই অ্যাম সরি। ম্যাডাম, আপনি বুঝতে পারছেন না, জগৎ শা-র ফিউনারালে আপনি না গেলে প্রেসে কত রকম কথা রটবে। খুব খারাপ এফেক্ট হবে। অবশ্যই যাওয়া উচিত।

তার জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা কেন ?

তুমি এখন অলমোস্ট টপ পজিশনে আছ। সাউথ থেকে সুরযকুমারী ধাঁ ধাঁ করে উঠে আসছে। মহেশজির ছবিতে যদি ও চান্স পায়।

মহেশজির সঙ্গে আমার কন্ট্রাক্ট হয়ে আছে। এর পরের দুটো ছবিরও। তোমাকে এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

সোফি, আমি তোমার ভালোর জন্য বলছি।

আবেগের চোটে ঘরের মধ্যে কয়েক পা চলে এসেছে ইমতিয়াজ। খানিকটা নেশায় চকচক করছে তার দু'চোখ।

সোহিনী হঠাৎ চড়া গলায় বলল, শাট আপ ! বলেছি আমার নাম ধরে ডাকবে না। নাউ, লিভ মি অ্যালোন।

ধমক খেয়ে চুপসে গেল ইমতিয়াজ।

মিনমিন করে বলল, আমি একবার মাত্র একটা দোষ করে ফেলেছি, তা তুমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারো না ? আমি সত্যি সত্যি তোমার ওয়েল উইশার।

সোহিনী এবার দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল ইমতিয়াজ। সোহিনীর মেজাজকে সবাই ভয় পায়।

মিনিট পাঁচেক বাদে ফিরে এল ললিতা। তার সঙ্গে শশী।

শশীর মুখ দেখলে সব সময় মনে হয়, তার ঘাড়ে সারা পৃথিবীর দায়িত্ব। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এ দাড়ি কখনও বাড়ে না আবার দাড়ি কামানো চকচকে মুখও দেখা যায় না।

শশী বলল, কুরুতুলাইন, তুমি নাকি এখানে থেকে যেতে চাইছ ?

সোহিনী এবার বইটা মুড়ে রেখে উঠে বসে বলল, আজ কী ব্যাপার হল, সবাই কি আমার

সোহিনী নামটা ভুলে গেল ?

শশী বলল, তোমাকে তো সেই প্রথম থেকেই দেখছি। তোমার নামটা তো বদলে দিলেন দিলীপকুমার, মনে আছে ? তিনি কিন্তু এখনও তোমায় এই নামেই ডাকেন।

সোহিনী বলল, কিন্তু আপনাকে এই নামে ডাকার অধিকার দেওয়া হয়নি।

আগে তোমার এত মেজাজ ছিল না। তুমি আমাকেও ধমকে কথা বলছ ?

শশীদা, জানেনই তো এক-একদিন আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন একটা কিছু বই না পড়লে আমার মাথা ঠিক হয় না। কেউ আমাকে বই পড়তে দিচ্ছে না। এই ললিতাটাই যত নষ্টের গোড়া। তোর ওই কথাটা বাইরে গিয়ে সবাইকে বলার কী দরকার ছিল ?

বাঃ বলব না ? তুমি পাগলামি করতে চাইলে আমরা সবাই মেনে নেব ?

শশীদা, আমি যদি এখানে আরও কয়েকটা দিন থেকে যাই, তাতে কোনও অসুবিধে আছে ?

অসুবিধে আছে তো বটেই।

টাকাপয়সা যা লাগে আমি দিয়ে দেব।

টাকাপয়সা ছাড়াও অনেক অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে।

কীসের অ্যারেঞ্জমেন্ট ? আমার খাওয়া-টাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আলি ব্যবস্থা করে দেবে।

আজ রাত্তিরেই পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে ?

পুলিশ ? পুলিশ কেন ?

তোমার সিকিউরিটি লাগবে না ? তোমার কিছু একটা বিপদ হয়ে গেলে সবাই আমাকে দুষবে। আমি পুরোনো লোক, আমার দায়িত্বজ্ঞান আছে।

বিপদ ? কী বিপদ হবে ?

তোমার মতন মেয়ের কী বিপদ হতে পারে, তা তুমি বোঝ না ? তুমি কি কচি খুকি ?

ঠিক আছে, পুলিশের ব্যবস্থা করুন।

তুমি থাকবে ?

ইয়েস ! অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফাইনাল।

এরপর রাকেশ যখন এল, তার মধ্যে সোহিনীর বইটির মাত্র দু-পাতা পড়তে পেরেছে।

রাকেশ নিজে থেকে আসতে চায়নি।

ললিতার কাছে প্রথম কথাটা শুনে সে রেগে উঠে বলেছিল, ঠিক আছে, যেতে চায় না তো যাবে না। তার আমি কী করব ?

সবাই তাকে বুঝিয়েছে যে এখন রাগারাগির সময় নয়। অর্ধেকের বেশি শুটিং হয়ে গেছে, এখন এই ফিল্ম শেষ না হলে সবারই ক্ষতি এই অবস্থায় টিম স্পিরিট ঠিক রাখতে হবে।

জগৎ শা-র অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে সোহিনী উপস্থিত না থাকলে খুবই খারাপ দেখাবে। তা নিয়ে অনেক কথা উঠবে। রাকেশের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ?

রাকেশ দীর্ঘকায়, সুপুরুষ। প্রথম দিকে তার কাকার প্রোডাকশনে সে অভিনেতা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রথম ছবিতেই সে বাতিল হয়ে যায়। তার একটু তোতলামির দোষ আছে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে সেটা আরও বেড়ে যায়। হলিউডের তারকা ব্রুশ উইলিসও তোতলা, সে সেটা অনেকটা চেষ্টা করে সারিয়েছে। আর এমন কায়দা করে থেমে থেমে কথা বলে যে তোতলামিটা বোঝা যায় না। রাকেশ সে রকম ম্যানেজ করতে পারেনি।

তারপর পরিচালনায় এসে পর পর দুটো ছবি হিট।

রাকেশ সোহিনীর বিছানার এক পাশে বসে নরম গলায় বলল, সোফি, তুমি এখানে থেকে যেতে চাইছ ?

সোফি বলল, হ্যাঁ, কয়েকটা দিন। একটু নিরিবিলিতে থাকব।

রাকেশ বলল, সত্যি, এখন সবাই ওখানে কান্নাকাটি করবে, কেউ কেউ ন্যাকা সেজে বাড়াবাড়ি করবে ক্যামেরার সামনে, এর মধ্যে যেতে কারই বা ভাল লাগে। কিন্তু তুমি এখানে থাকলে আমাকেও যে থেকে যেতে হয় !

কেন ?

বাঃ, তুমি থাকবে আর আমি চলে যাব ? তা হয় নাকি ? অথচ ওদিকে আমি না গেলে ...

তুমি না গেলে তো চলবেই না। তোমার নিজের আংকল। তোমাকেই সব কাজ করতে হবে। তা ছাড়া জগৎ শা-র ছেলেটিও মারা গেছে। বিষয়-সম্পত্তির কী হবে, ... তুমি যাও।

সোফি, তোমাকে ফেলে আমি কী করে যাব ? এখন তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে পারব না। এই সময় তোমাকে আমি পাশে চাই।

এই সময়ে আলাদা আলাদা থাকাই ভাল। প্রেসের লোকেরা সর্বক্ষণ চারপাশে ঘোরাঘুরি করবে।

আমার একটা অনুরোধ শুনবে সোফি ? প্লিজ চলো আমার সঙ্গে।

রাকেশ, আজ বুঝি তুমি ড্রিংক করোনি ?

হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছো কেন ?

তোমার গলাটা বেশি বেশি নরম শোনাচ্ছে।

আমি কখনও তোমার সঙ্গে কড়া গলায় কথা বলি ? অন্যদের সঙ্গে বলি। তুমি এখানে এখনই বা কেন একা একা শুয়ে থাকবে। বাইরে সবাই এক সঙ্গে বসে আছে। চলো, চলো।

রাকেশ সোহিনীর একটা হাত ধরে টানল।

সোহিনী হাত ছাড়িয়ে না নিয়ে বলল, শোন রাকেশ, তোমাকে একটা কথা বলি। একটা সময় ছিল, যখন আমি সবার কথা শুনে চলতুম। যে যা বলত, কেউ জোর করলেও প্রতিবাদ করার সাহস হত না। তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে আমার জীবনে। এখন আমি স্বাধীন। জানি, আমি বেশি বেশি জেদী হয়ে গেছি। যেটা ইচ্ছে নয়, অন্য কেউ হাজার জোর করলেও আর তা থেকে আমাকে টলাতে পারে না। আমি এখানে থেকে যাব ঠিক করেছি, থাকব। আমাকে জোর করে কোনও লাভ হবে না।

ললিতা আর কথা বলেনি সোহিনীর সঙ্গে।

রাত তিনটে পর্যন্ত সবাই বাইরে বসে ছিল, সোহিনী ছাড়া। সেখানেই পান-আহার হয়েছে। এক সময় মৃত্যু-টৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে গানও গেয়েছে কয়েকজন। অনেকটা ক্যাম্প ফায়ারের মতন।

মধ্যে দু-একবার ঘরে এসে ললিতা দেখেছে, আলো জ্বলছে, চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সোহিনী, চোখ খোলা, বইও আর পড়ছে না।

তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দু-ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে ললিতা। জেগে আছে সোহিনী। এবারও কোনও কথা বলল না।

ললিতা তৈরি হওয়ার জন্যে চলে গেল বাথরুমে।

ফিরে এসে দেখল, সোহিনী এর মধ্যে উঠে পোশাক বদলে ফেলেছে। নিজের ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছে ব্যস্ত ভাবে।

একটু ঠেস দিয়ে ললিতা বলল, কী ব্যাপার ?

সোহিনী গম্ভীর ভাবে বলল, আমিও ফিরে যাচ্ছি।

অনেকটা ভুরু তুলে ললিতা বলল, তার মানে ?

সোহিনী বলল, মানেটা খুব সোজা। আমি মত বদলে ফেলেছি।

কাল রাত্তিরে অত কাণ্ড করে, সবার সঙ্গে ঝগড়া করে --

কাল আমার মুড অন্যরকম ছিল।

এর নাম মুড ? ধন্যি মেয়ে বাবা ! সবাই বলাবলি করছিল -- তুই সত্যিই যাচ্ছিস আমাদের সঙ্গে ?

সত্যিই যাচ্ছি। সবাইকে বলবি, কাল আমি তোদের সঙ্গে রসিকতা করেছি। আসলে আজ আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই যাব তোদের সঙ্গে।

সবাই হই হই করে উঠল সোহিনীকে দেখে।

রাকেশ আর দেবশঙ্করের আলাদা আলাদা গাড়ি। দেবশঙ্কর তো কথা বলবেই না, বরং অনেক দিন পর সোহিনী নিজে থেকেই তাকে বলল, গুড মর্নিং, দেব।

রাকেশ চায় সোহিনীকে তার নিজের গাড়িতে তুলে নিতে।

সোহিনী কিছুতেই রাজি হল না। সে যাবে ললিতাদের সঙ্গে ট্রাকে। যেমনভাবে এসেছিল।

ভাল করে গদি-টদি পেতে তার জন্য জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। সোহিনীর মতন নায়িকারা আলাদা গাড়িতেই যায়, কিন্তু এটা তার খেয়াল।

ললিতার পাশে বসেছে, কিন্তু একটাও কথা বলছে না। দু-পাশের দৃশ্যের দিকেও তার মন নেই।

এক সময় ললিতা লক্ষ করল, সোহিনীর দু-চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

প্রত্যেক ফিল্মেই বেশ কয়েকবার কাঁদতে হয়। শট এন জি হলে একই দৃশ্যে বারবার কান্না। তাই অন্য সময়ে আর কান্না আসে না।

ললিতা জিজ্ঞেস করল, তোর কী হয়েছে, সত্যি করে বল তো ? এ রকম তো আগে কখনও দেখিনি ? এখানে নতুন করে কারওর প্রেমে পড়েছিলি ?

সোহিনী আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

ললিতা আবার জিজ্ঞেস করল, সেই জন্যই থেকে যেতে চেয়েছিলি ?

সোহিনী বলল, হ্যাঁ। কিন্তু আমার জায়গা তো নকল জগতে, এই ছবির জগতে, এখানে এই প্রকৃতির মধ্যে আমাকে মানাবে না।

ললিতা বলল, তা হলে যাকে ভালবেসেছিলি, তাকে তোর সঙ্গে আসতে বললি না কেন ?

সোহিনী এবার ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বলল, তার বয়েস যে বড্ড কম। সে আমার ভালবাসা বুঝবে না।

তারপর সে মুখ ঢেকে ফেলল দু-হাতে।